

সোফিয়া

রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

স্মৃতি-তর্পণ

বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকার দার-এস-সেলামএ গিয়ে একজন ভারতীয় কৃতী সন্তানের নাম শুনে বেশ আনন্দ হয়েছিল। তিনি বাংগালী ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর যথাসম্ভব সংবাদ জানার জন্য মনে আরও ঔৎসুক্য এসেছিল। ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা কয়েকদিন মনের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্ত্তনও এনে দিয়েছিল। নিজকে বাংগালী বলে পরিচয় দিতে বেশ গর্বও অনুভব হচ্ছিল, কিন্তু বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকা ছাড়বার পূর্বেই সেই ভাব আর মনে ছিলনা। ব্যারিস্টার এস, এন, ঘোষের নাম যেমন ভুলে গিয়েছিলাম, তাঁর নামেই দার-এস-সেলামএ যে একটি পথেরও নাম হয়েছে সে কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। এ সংসারে কত ধনীলোক আছে, তাদের কজনের সংবাদ আমরা রাখতে সক্ষম হই?

তৃতীয়বারের পৃথিবী ভ্রমণের পালা সমাপ্ত করে কয়েক দিন যখন একটা হোটেলে আরামে দিন কাটাচ্ছিলাম তখন একদিন উক্ত ব্যারিস্টার ঘোষের পুত্র যুবক বিমলেন্দ্রনাথ এসে আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে আমার পূর্বস্মৃতি দার-এস-সেলামএর কথা মনে হল বটে কিন্তু বিমলেন্দ্রের দেখা পেয়ে মোটেই আনন্দিত হইনি। তাই শুধু বলেছিলাম—"ভালই দেখা হল।" এর বেশি আমার কিছুই বলার ছিলনা, কারণ ধনীশ্রেণীটার ওপর আমার একটা বীতশ্রদ্ধা রয়েছে। বিমলেন্দ্র আমার কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি একজন ছাত্র। আমি ছাত্রদের খুব ভালবাসি, তারা ধনীর ছেলেই হোক বা গরিবের ছেলেই হোক। কাজেই আমার দরজা

তাঁর কাছে খোলাই ছিল। এতে করে তাঁর সংগে আমার বেশ ঘনিষ্টতা হতে লাগল, অন্যদিকে তাঁর কাজকর্মের কথাও শুনতে পেলাম।

একদিন বিমলেন্দ্র আমার সংগে সিলেটি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন অবিকল যেন সদরের একটি লোক কথা বলছে। বিমলেন্দ্র খিদিরপুরের খালাসী মহলে সিলেটীদের সংগে থাকতেন এবং যাতে করে খালাসীরা তাদের সামাজিক, মানসিক এবং আর্থিক উন্নতি করতে পারে তার চেষ্টা করতেন, সেই সূত্রেই তাঁকে সিলেটি কথা শিখতে হয়েছিল। তাঁর কার্যাবলীর সংবাদ খুব কম লোকই জানত। যেদিন আমি প্রথম শুনলাম বিমলেন্দ্র খালাসীদের উন্নতির চেষ্টা করছেন সেদিন আমি কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। ধনীর ছেলেরা দুটি মাত্র কারণে মার্কসবাদকে সমর্থন করে। প্রথম কারণ হল, ধনীদের মধ্যে ছোট বড় আছেই। যখন কোন ছোট ধনী দেখে বড় ধনীকে কোন মতেই কাবু করতে পারবেনা তখন তার মনে মোটেই শান্তি থাকেনা। মনের শান্তি ফিরে পাবার জন্য সে মার্কসবাদ পাঠ করে এবং মুখে মুখে মার্কসবাদ সমর্থনও করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখনই দেখে তার যা আছে তাই মার্কসবাদীরা নিতে বসেছে তখন আর সে মার্কসবাদী থাকেনা, সে তার দলে ভিড়ে গিয়ে মার্কসবাদীদের গলার ফাঁসির রশি হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কারণটি হল, ধনীরা মার্কসবাদ পাঠ করে মার্কসবাদীদের ফাঁদে ফেলে তাদের গলা টিপে মারবার জন্যই।

কিন্তু বিমলেন্দ্র ছিলেন ভিন্ন জাতের। বিমলেন্দ্রের পিতা দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। পিতার সংগুণ পুত্রে বিকশিত হয়েছিল দ্বিগুণ তেজে এবং বৃহত্তর ভাবধারা নিয়ে। পিতা গরিবের সাহায্য করতেন, আর পুত্র দেখলেন দারিদ্র্যের কারণ যদি লোপ না হয় তবে দারিদ্র্য

থাকবেই। সেজন্য তিনি নীরবে দরিদ্র মজুরদের মাঝে থাকতেন এবং তাদের সৎ উপদেশ দিতেন যাতে করে তাদের ন্যায্য দাবী ধনীদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। বিমলের মুখ থেকে বের হচ্ছিল—তোমরা এক হও, দেখবে তোমাদের দাবী ওদের মানতে হবেই। তিনি নিজে ধনীর সন্তান হয়েও ধনতন্ত্রবাদের পরম শত্রু ছিলেন। শুধু যে মুখে মুখেই তার নিপাত করতেন তা নয়, কাজেও দেখিয়ে গেছেন তাঁর আন্তরিকতা। এরূপ দৃষ্টান্ত অতি কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাই সিলেটি খালাসীদের তরফ থেকে 'লাল চীন' বিমলেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

তিনি ছিলেন প্রকৃত কর্মী। কিন্তু আমার কাজের ক্ষমতা আর নেই, তাই অন্তর থেকে শুধু বলি—ধনতন্ত্রবাদ জাহান্নামে যাক!

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভূমিকা

চীনের অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোক অতি অল্পই অবগত আছেন। বৈদেশিক লেখকগণ চীন-দেশে গিয়ে চীনের বৈদেশিক অধ্যুষিত শহর এবং বন্দর (Treaty Ports) দেখেই শুধু বই লিখেছেন। বৈদেশিক অধ্যুষিত শহর এবং বন্দরগুলিতে নানারূপ পাপের প্রচলন হয়েছিল। এই পাপ তরংগের সৃষ্টি হয় যখনই পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে। কেউ তা রুখতে সক্ষম হয় না যে পর্যন্ত পুঁজিবাদ বেঁচে থাকে। তবে কথা হল ইউরোপ এবং আমেরিকাতে পুঁজিবাদপ্রসূত যে পাপ তরংগের সৃষ্টি হয় তা অতি মার্জিত এবং সাদা চোখে অতি কমই দেখা যায়। পূর্বদেশীয় সভ্যতার আওতায় যারা আছে তাদের মধ্যে পুঁজিবাদপ্রসূত পাপ তরংগ বেশ ভাল করেই দেখা যায় বলেই সাদা চোখের বক্রদৃষ্টি তাতে সহজেই এসে পড়ে। ইউরোপীয় লেখকগণ তাদের নিজের কথা ভুলে গিয়ে বদ দৃষ্টিভংগিতে যখন চীনদেশ সম্বন্ধে বই লেখেন তখন চীনকে বেজায় আক্রমণ করে কালি কলমের সার্থক করেন।

ইউরোপীয় লেখকগণ চীনাদের nasty creatures বলতেও ছাড়েন নি। আবার কখনও বা চীনাদের একটু প্রশংসা করেই জাপানের দিকে চোখ ফিরিয়ে জাপানকে বেশ প্রশংসা করে চীন সম্বন্ধে বই লেখা সমাপ্ত করেছেন। এরূপ হবার প্রথম কারণ হল ইউরোপীয় লেখকগণ মৌলিক ভাবে কোন চিন্তাই করেননি। সাম্রাজ্যবাদী অদূরদর্শী লেখক মৌলিকত্বের ধার ধারেন না। তাঁরা মনে মনে ভাবে

তাদের কথাই অটুট সত্য। কিন্তু সত্যের স্বরূপ জ্ঞানীদের কাছে এখনও নির্ণয় হয়নি।

চীনের গ্রাম ইউরোপের জন্ম নেবার বহুপূর্বেই গড়ে উঠেছিল। তবে চীনের গ্রাম সময়ের সংগে পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারেনি এই যা দুঃখ। ইউরোপীয় লেখকগণ কখনও ভাবেন নি মানব সভ্যতার প্রসারণ দেশ কাল পাত্র হিসাবেই হয়ে থাকে। তখনকার দিনের পরাধীন, সহায়হীন ইংরেজ জাতের পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধণ হবার কারণ যদি তাঁরা জানতেন তবে চীনের ওপর তাঁরা কুকথার কাদা ছুঁড়ে ফেলতন না। কুশিক্ষার ফল বড়ই খারাপ।

চীনের বিরুদ্ধে ইরোপীয় লেখকদের অবাস্তব কথা বলার আরও একটি কারণ ছিল। সেই কারণটি হল, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা চীন দেশটাকেও তাঁদের মধ্যে ভাগ করে নেবার প্রয়াসে ছিলেন। সেরূপ প্রয়াসকে ফলবতী করতে হলেই অনর্থক দোষ খোঁজার দরকার হয়। সেই দোষ খুঁজতে গিয়ে অনেক ভাড়াটে লেখক ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের মাঝেও প্রতিযোগিতা চলে। সেই প্রতিযোগিতা ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যেমন হয় অন্য কোন ব্যাপারে তেমন হয় না। বাঁটোয়ারার দিক দিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল বলেই চীন অখণ্ড থেকে যায়। শুধু চীনের ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর খবরদারী করার জন্য জাপান সমেত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের কতকগুলি বন্দর বিশেষ সুবিধা হিসাবে (Extra-territorial Rights) করায়ত্ত করে। এতে চীনের ক্ষতি হল না, লাভই হল। কুসংস্কারগ্রস্ত চীনারা দেখতে পেল, পুরাতন মতে চললে তাদের আর বেঁচে থাকা হবে না। বিপরীতে হিতেরই সূচনা হল। সময়ও পুরাতনকে পা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুনকেই কোলে তুলে নিচ্ছিল।

রুশদেশে যেদিন সোসিয়ালিজম কায়েম হল সেদিন সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা নিষ্পেষিত জনগণ দেখল, যদি পৃথিবীতে শান্তি আনতে হয়, যদি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় তবে প্রত্যেক দেশেই সোসিয়ালিজম কায়েম করতে হবে। চীনের শিক্ষিত সমাজ সে দিকে যেন একটু বেশিই ঝুঁকে পড়েছিল। এতে সাম্রাজ্যবাদীদের টনক নড়েছিল। কি করে চীনদেশকে বলসেভিজম হতে রক্ষা করা যায় তার জন্য সকলের মধ্যেই চান্‌চল্য এসে দেখা দেয়। কিন্তু কথা হল কি করে সেই সাম্রাজ্যবাদদ্রোহী বলসেভিজমকে রুখা যায় তাই নিয়ে যখন সকলেই চিন্তামগ্ন তখন জাপান হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল রুশকে মানচুরিয়ার সীমানায় রুখা অতি দরকার। জাপান এমনও বলতে লাগল যে যদি রুশকে মানচুরিয়ার সীমাতে রুখা না যায় তবে তার নিজের অস্তিত্বই থাকবে না। এরূপ চেঁচামেচির পর জাপান যখন দেখল কোন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীই তার কথায় প্রতিবাদ করছে না তখন হঠাৎ একদিন জাপান মানচুরিয়া আক্রমণ করে করায়ত্ত করে ফেলল। রাতারাতি হেনরী পুই-কে সম্রাট সাজিয়ে চাংচুংএর গদিতে বসিয়ে দিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবল, এ আবার হল কি! কিন্তু উপায় আর ছিল না। জাপান্ অনুনয় বিনয় করে চিৎকার করতে লাগল মানচুরিয়াই তাদের ধমনী (Life line). ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা যে কোন প্রকারেই হউক জাপানের অনুনয় বিনয় পরোক্ষভাবে মেনে নিলেন। জাপান অনেকবারই মানচুরিয়া করায়ত্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদারা তাতে সায় দেননি। এবার রুশের ভয়েই মানচুরিয়া জাপানের হাতে তুলে দিতে হল।

মানচুরিয়ার অপর নাম—'পূর্ব-তিন-প্রদেশ' (Three Eastern Provinces). জাপান তিনটি প্রদেশই দখল করেছিল। এতে জাপানের

সুবিধা হল না। জাপান আবার তর্ক উঠাল মানচুরিয়া চীনের তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত নয়, মানচুরিয়া চীনের পাঁচটি প্রদেশ নিয়েই গঠিত, জেহোল এবং চাহার তার অন্তর্গত। এবার বিদেশ হতে কমিশন আসলেন মানচুরিয়া চীনকে ফিরিয়ে দেবার জন্য নয়, মানচুরিয়া তিনটি কি পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে তা ঠিক করার জন্য। জাপান দেখল এসব কমিশন তার কিছুই করতে পারবে না, অতএব আর অপেক্ষা করে লাভ কি, জেহোল এবং চাহার দখল করাটাই সমীচীন। তাই কমিশন চীন দেশে মজুদ থাকার সময়েই জেহোল আক্রমণ করে বসল। চীনা যুবসমাজ তাতে বাধা দিল। দেখা গেল চীনা যুবসমাজ লাল ঝাণ্ডা আগে রেখেই জাপানীদের আক্রমণ করছে। কমিশন বুঝলেন জাপানীদের জেহোল এবং চাহার দখল করাই দরকার। ডাঃ ওয়েলিংটন কু বোধহয় তার আভাসও পেয়েছিলেন। তাই যারা জেহোল এবং চাহারে লড়ছিল তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সাহায্য পায়নি। তা বলে তারা জাপানীদের বশ্যতা স্বীকার করেনি, এখনও তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সেই যুদ্ধকে বলে গোপন যুদ্ধ যার নাম গড়িলা হবে না গড়েলা হবে এখনও ঠিক হয়নি। শব্দতত্ত্ববীদগণ, গোপন যুদ্ধ এক প্রকারের আর শব্দ অন্য রকমের এটা সকল সময়েই মনে রেখে বক বক করো।

দুনিয়াদারী এক আজব চিজ। অবশ্য কথাটা খাটে শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকৃত দেশেই। সেই আজব চিজকে পরিত্যাগ করবার জন্যই দেশ পর্য্যটন শুরু করেছিলাম। দুনিয়াদারীর সংগে রাষ্ট্রনীতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে। দুনিয়াদারীতে দয়া মায়ার এখনও বেশ প্রচলন আছে, পলিটিক্সএ কিন্তু তার লেশও নেই। চীনদেশে প্রবেশ করেই পলিটিক্সএর আওতায় পরোক্ষ ভাবেই এসে পড়ি।

এতে সংবাদ সংগ্রহ করার পক্ষে আমার সুবিধা হয়েছিল যথেষ্ট কিন্তু শারীরিক কষ্ট পেতে হয়েছিল বেশ ভাল করেই। যাকগে সেসব দুঃখের কথা। এখন চীনের মধ্যে প্রবেশ করার পর আমি কি কি সংবাদ পেয়েছিলাম তাই সংক্ষেপে বলছি।

চিয়াং কাই-শেক চীনদেশের পাঁচটি প্রদেশ হারাবার পরও জাপানীরা নতুন করে কতকগুলি প্রস্তাব হাজির করল। এতে বলা হয়েছিল জাপানীদের বিরুদ্ধে চীন দেশে যে প্রচার চলেছে তা থামাতে হবে। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শুধু সোসিয়ালিস্টরাই প্রচার করত, আর সবাই শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাসই পরিত্যাগ করত। চিয়াং কাই-শেক বোধহয় স্বং পরিবারের স্বার্থ রক্ষার্থেই জাপানীদের এই আদেশটুকুও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরই ফলে এক দল লোকের মধ্যে একতার বৃদ্ধি পেতে লাগল যারা উগ্র ন্যাশানালিস্ট বলে পরিচিত ছিল—তরুণ মার্শাল চিয়াং হুয়া-লিয়াং তার মধ্যে অন্যতম। তিনি বেশ ভাল করেই বুঝলেন বর্তমান সংকীর্ণ ন্যাশানালিস্ট মত দেশের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। দেশে অরাজকতা শুরু হয়েছে, লোকে খেতে পাচ্ছে না, মজুরদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার চলছে। এর যদি প্রতিবিধান করতে হয় তবে তাঁকে জনসমাজের দিকেই ঝুঁকে পড়তে হবে। তিনি ক্ষণ বিলম্ব না করে মনে মনে সেদিকেই ঝুঁকে পড়েন এবং মানচুরিয়াতে যে সকল লোক জাপানীদের তাড়াবার চেষ্টা করছিল তাদের সাহায্য করতে থাকেন। এরই ফলে বৈদেশিকদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি চিয়াং হুয়া-লিয়াং-এর বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচার করতে থাকে। তখন জেনারেল চিয়াং কাই-শেক ভাল করেই বুঝলেন, জাপানীরা মানচুরিয়া, জেহোল এবং চাহার দখল করেনি, এসব স্থান ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী

জাপানকে দিয়েছে রুশকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যই। তরুণ মার্শাল চিয়াং ছুয়া-লিয়াংকে পিকিনে বসিয়ে রাখা উচিৎ হবে না ভেবে জেনারেল চিয়াং কাই-শেক তাকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেন।

জাপানীদের বিরুদ্ধে মানচুরিয়ায় যারা লড়াই করছিল জেনারেল মা-চান্দ-সান ছিলেন তার অন্যতম। মার্শাল চিয়াং ছুয়া-লিয়াং পিকিনে থাকার সময়েই বাধ্য হয়ে মা-চান্দ-সানকে সকল রকমের সাহায্য হতে বঞ্চিত করেন। তারই ফলে মা-চান্দ-সান রুশদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যান্য যাঁরা মানচুরিয়াতে গড়িলা যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন, পেছনে সাহায্যের অভাবে তাঁরাও একে একে খাস চীনের মধ্যেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু কতকগুলি যুবক রয়ে গিয়েছিল মরবার জন্য। তাদের মরনের পেছনে একটা বড় কর্তব্য ছিল। সেই কর্তব্য হল যাতে করে জাপানীরা মানচুরিয়ার কয়লার খনিগুলিতে কোনরূপ কাজকর্ম না চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তারা সেই ব্যবস্থা পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। জাপানীরা মানচুরিয়ার খনি হতে এখনও বেশি কয়লা উঠাতে পারছে না। চীনারা মরতে শিখেছে তখন থেকেই, তাই সাম্রাজ্যবাদী জাপানী গুণ্ডাদের সায়েস্তা করতে সমর্থ হচ্ছে জীবনের বিনিময়ে।

মার্শাল চিয়াং ছুয়া-লিয়াং বিদেশে থাকার সময় দক্ষিণ চীনে কমিউনিস্ট এবং ন্যাশানালিস্ট উভয়ের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। মাও-সুতন দক্ষিণ হতে উত্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়। তারপর যখন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর চাপে পড়ে জেনারেল চিয়াং কাই-শেক উত্তরে গিয়েও চু-তে'কে আক্রমণ করেন তখন ন্যাশানালিস্ট নেতা মার্শাল চিয়াং ছুয়া-লিয়াং আর নীরবে সুবোধ ছেলের মত কাজ করে যেতে

রাজি না হয়ে আদেশকারী চিয়াং কাই-শেক'কেই আটক করে বসেন এবং চীনের যাতে আর ক্ষতি না হয় সেজন্য ন্যাশানালিস্ট'ও কমিউনিস্ট মিলে মিশে যাতে চীনের উন্নতি করতে পারে তার ব্যবস্থা করেন।

যখন দেখা গেল ন্যাশানালিস্ট আর কমিউনিস্ট মিলে গিয়েছে তখন জগতের সাম্রাজ্যবাদীদের ফের টনক নড়ল। চীনকে আর গড়তে দেওয়া মোটেই উচিৎ নয় ভেবে সাম্রাজ্যবাদী জাপান এ সুযোগে আবার চীন আক্রমণ করে বসল। হাজার হউক জাপান নতুন সাম্রাজ্যবাদী, কূটনীতিতে এখনও পেকে উঠেনি। লোভের তাড়না নীরবে সহ্য করার মত শক্তি অল্পই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তাই জাপান পাগলা লোভের নিবৃত্তির জন্য, তানাকা মেমোরিয়াল কার্যে পরিণত করার জন্য, হঠাৎ চীনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।

অবুঝ হয়ে যখন জাপান চীনকে আক্রমণ করল তখন চীনের ন্যাশানালিস্ট আর কমিউনিস্ট মিলে গিয়ে 'কমন ফ্রণ্ট' তৈরী হল। জাপানের দাপট হঠাৎ হাংকো'র কাছেই বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু হল। স্বার্থের খাতিরে চীনদেশের ন্যাশানালিস্ট ও কমিউনিস্ট মিলনের মাঝে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা আর ভাংগন ধরাবার ব্যবস্থা করল না। এতে সারা পৃথিবীব্যাপী সোভিয়েট স্থাপন করার সুযোগ এবং সুবিধা পুরামাত্রায় এসে পড়ল। এজন্যই জ্ঞানীগণ বলে গেছেন অহিত হতে অনেক সময় হিতের সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে একতাবদ্ধ হয়ে থাকবার সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এতে তাদের সর্বনাশ ত হবেই উপরন্তু জাপানকেও প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলে ডুবতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সবাই চায়। সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানকে মানচুরিয়া তুলে দিয়েই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছে প্রথম। জেনারেল চিয়াং কাই-শেক ইউরোপীয়

সাম্রাজ্যবাদীদের একদিন সাহায্যকারী ছিলেন, এখন তার কার্যকলাপ ঠিক তার বিপরীত। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যে যৌবনোচিত মহান হৃদয় অর্জন করতে পারে তিনি তার প্রথম দৃষ্টান্ত। মাও-সুতন আর এক মহান ব্যক্তি। তিনি তার পরম শত্রুকেও আপন করে নিয়েছেন, সেজন্য তিনিও পৃথিবীপূজ্য হয়ে থ।কবেন।

চীনের স্বার্থত্যাগ আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্য যে-কোন জাতের চেয়ে বেশি। সেজন্য চীনের শহীদদের স্মরণ করে আমি মাথা নত করছি।

'মরণবিজয়ী চীন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বেশ ভাল করেই বুঝেছেন আমি ইউরোপীয় লেখকদের পদাংক অনুসরণ করিনি। 'লাল চীন' লেখার সময়েও পূর্বের মতই বজায় রেখেছি। এতে কোন বই হতে কোনরূপ উদ্ধৃত বিষয় নেই। যা অনুভব করেছি, যা দেখেছি তাই লিপিবদ্ধ করেছি। সকলেই জানেন আমার বিদ্যা বুদ্ধি খুবই কম, আমিও সেটা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। আমার দেশবাসী দয়াকরে যদি আমার এ বইখানাকেও 'মরণবিজয়ী চীন'এর মতই দেখেন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়
১৩৫০

—গ্রন্থকার



সোভিয়েট রুশিয়া
মাঞ্চুরিয়া
হারবিন
মুকদেন
মঙ্গোলিয়া
পাইপিং
টিয়েনসিন
খাস চীন
হাংকো
ক্যানটন
হিন্দুস্থান
উ
প
পূ
দ
ভ্রমণপথ

সোভিয়েটের সন্ধানে

চেংনাম নীরবে তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকদিন রোগে ভুগে আজ চেংনামের মা মরতে বসেছেন। মা কিছুই বলছেন না। তিনিও ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলেন। তারপর ঔপন্যাসিক ধরণে তার মায়ের মৃত্যু না হয়ে সাধারণ ভাবেই পরের দিন সকাল সাতটার সময় উপস্থিত গ্রামবাসীর সামনেই মারা যান। মায়ের জীবিত অবস্থায়ই চেংনাম তার জন্য অনেক কেঁদেছিল তাই তাঁর মরণের পর সে আর কাঁদল না। মায়ের মরা শরীরটার ওপর ছেঁড়া কম্বলখানা বিছিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে সে রৌদ্রের দিকে মাথা করে বসে রইল। বন্ধুরা বলে গেল চিন্তা করে আর কি হবে চেংনাম? আমরা ফিরে আসছি তারপর তোমার মাকে আজই কবর খুড়ে গোড় দেব। একজন বন্ধু কুড়িটি সেণ্ট নামের হাতে দিয়ে বলল যাও কিছু কিনে এনে খাও।

নাম কোনদিন চিন্তাও করেনি তাকে একদিন নিজের হাতে রান্না করে খেতে হবে। কিন্তু আজ তাকে নিজের হাতে রান্না করতে হবেই। চেংনামের এই পৃথিবীতে মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাজার করে এনে সওদা ঘরে রেখে ঘরের পেছনে জল উঠাতে গেল। সে দেখল বালতিটি উপরে নেই, কূয়ার ভেতর পড়ে গেছে। নাম বিলম্ব না করে বালতি উঠাল। বালতি কাদায় ভর্তি ছিল। কাদা ধোবার সময় নাম দেখল অনেকগুলি টিনের "ওর" তাতে লেগে আছে। নাম টিন খনিতে অনেক দিন কাজ করেছিল বলেই বুঝতে সক্ষম হল এখানে প্রচুর টিন আছে।

মায়ের কবর হল। নাম অলসভাবে বসে না থেকে কাজে ব্যস্ত

হল। সকলে বুঝল নাম তার মায়ের শোক অনেকটা সম্বরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নাম এদিকে পাতকুয়ার জল সেচে ফেলে দিয়েছিল এবং নীচটা খুঁড়ে টিন উঠিয়ে রোজই সেই টিন বাজারে বিক্রি করে বেশ দুপয়সা জমাতে ছিল। এমনি করে নাম হয়ে গেল একটা টিন খনির মালিক। স্থানীয় লোকে তাকে "তাউকী বুসার" বলত। মালয় সরকার তাকে 'জাষ্টিস অব পিস' উপাধি দিলেন। চেংনাম আর সেই পুরাতন বাড়িতে থাকল না নিকটেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরী করল। বাড়িতে হাইলাম বয়, কেন্‌-ট-নিজ কুক, পান্‌জাবী দারওয়ান এবং ইংলিশ সেক্রেটারী রাখল। চেংনামের নাম সেলাংগরের সব চেয়ে বড় শহর কুয়ালা-লামপুরের লোকও জানত এবং যখনই কোন সভা সমিতি হতো তখনই মিঃ চেংনামের ডাক পড়ত। কুয়ালা-লামপুরে এসে মিঃ চেংনামের সুনাম আমিও শুনেছিলাম, তাই ইচ্ছা করেছিলাম পথে যখন মিষ্টার চেংনামের বাড়ি পড়বেই তখন একবার সেই ধনী প্রবরকে দেখে গেলে ক্ষতিই বা কি? হয়ত লাভ হবারই সম্ভাবনা বেশী।

তখন ছিল ১৯৩১ সালের জুলাই মাসের শেষ ভাগ। মনসুন পুরাদমে শুরু হয়েছে। পথ ঘাট বৃষ্টির জলে ভেসে গেছে। স্থানে স্থানে দুহাত গভীর জল জমে রয়েছে। বৃষ্টি অনবরত হচ্ছিল। আমি বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে পথে চলছিলাম। কুয়ালা-লামপুর হতে রওনা হবার পরই কয়েকটা চীনা ডাকাত আমার পেছন নেয়। তাদের ধারণা ছিল আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে। ডাকাত আমার পেছন নিয়েছে সে কথা আমাকে কেউ বলে দেয়নি, আমি নিজেই বুঝেছিলাম। এ অন্‌চলের চীনারা ভুতের ভয়ে রাতে থর থর করে কাঁপে তা আমি জানতাম। ডাকাতরা রাতে ভুতের ভয়ে বের হবেনা এটাই আমার ধারণা ছিল। তাই এ অন্‌চলে রাতেই ভ্রমণ করছিলাম।

সেদিন রাতটা ছিল দারুণ দুর্যোগময়। অনবরত বৃষ্টি পড়ছিল, মাঝে মাঝে তুফানও বইছিল। সারারাত পথ চলে সকাল বেলা রাসাতে (Rasa) পেঁছে প্রথমই গেলাম স্থানীয় সরকারী ডিস্‌পেনসারীতে। তথায় একজন চীনা ডাক্তার রোগী পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। ডাক্তার আমার পরিচয় পেয়ে ঔষধ ত দিলেনই উপরন্তু আমাকে লজিং হাউসে থাকার বন্দোবস্তও করে দিলেন এবং বলেছিলেন তিনি সন্ধ্যার পর এসে আমার সংগে সাক্ষাৎ করবেন।

স্নান করে এক পেয়ালা কফি খেয়ে সেদিনের সংবাদপত্রখানা পড়ছিলাম। তাতে বিশেষ একটি সংবাদ ছিল। চীন দেশের কোথাও জলে ভেসে গেছে। কোথায় সে স্থান তা জানবার জন্য আপনা হতেই মন উদগ্রীব হয়েছিল। জলে যখন কোনও স্থান ভেসে যায় তখন তথায় দুর্ভিক্ষ এসে দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। যারা নিজে খেতে পায় না তারা অপর একজন বিদেশীকে কি করে খাবার দিতে সক্ষম হবে এটাই আমার অন্তরে বাজছিল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার অন্য একজন চীনা ভদ্রলোককে সংগে নিয়ে লজিং হাউসে আসলেন। কথা প্রসংগে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি চীন দেশে যাব কি না? চীন দেশে যাবার জন্য আমি ভয়ানক ইচ্ছুক তা তাঁদের জানালাম। আমার কথা শুনে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন চীন দেশে প্রবেশ করার জন্য চীন কন্‌সাল হতে 'ভিসা' নিয়েছি কি না? আমি চীন কন্‌সাল হতে চীন দেশে প্রবেশের ভিসা নিয়েছিলাম, তা তাঁদের দেখালাম। ডাক্তারের সাথী আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনার সংগে আমি কথা বলতে চাই, যদি আরও দুটা

দিন এখানে থাকেন তবে বড়ই ভাল হয়। আমি তাতে রাজি হলাম। ডাক্তার এবং তার সাথী বিদায়ের বেলা আমার হাতে এক ডলারের ছয় খানা নোট দিয়ে বললেন এতেই আপনার দুদিন ভাল করে চলবে। আমি নোট ছয় খানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে এদেরই কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

চীন দেশেতে প্রথম বিপ্লবের পর থেকে প্রবাসী চীনারা প্রায়ই টাকা পাঠিয়ে চীন সরকারকে সাহায্য করতেন। চেংনামও চীনা দরিদ্রের সাহায্যার্থে চীন দেশে অনেক টাকা পাঠিয়েছেন। এই সংবাদ আমি কুয়ালা-লামপুরে শুনেছিলাম। পরের দিন সকালবেলা যখন ডাক্তার এবং তাঁর সাথী আমার সংগে দেখা করতে আসলেন, আমি তাঁদের মিঃ চেংনামের বদান্যতার নিদর্শন সংবাদপত্রে দেখিয়ে বললাম, এ লোকটির সংগে দেখা করার জন্যই এখানে এসেছি। এই লোকটি একদিন নিতান্ত দরিদ্র ছিল, এখন ধনী হয়েও দরিদ্রের কথা ভুলেনি। এমন লোকের সংগে সাক্ষাৎ করাটা নিতান্ত দরকার মনে করি। আমার কথা শুনে ডাক্তারের সাথী আমার হাত হতে সংবাদপত্রখানা টেনে নিয়ে একদিকে রেখে দিলেন। যে চেয়ারে তিনি বসেছিলেন সেই চেয়ারখানা আমার কাছে টেনে এনে বসে বললেন "চীন দেশের দরিদ্রদের বাঁচবার জন্য মিঃ চেংনাম একটি পয়সাও দেননি। তাঁর মা ঔষধ না পেয়ে রোগে মরেছিলেন সেজন্য তিনি অনেক হস্‌পিটাল খুলেছেন তা খুবই সত্যকথা, কিন্তু তাঁরই গরীব মায়ের মত কত মা মালয় এবং চীন দেশে গণিকা বৃত্তি করে ভরণ পোষণ করছে তার খবর তিনি রাখেন না। চীন দেশের কত অপ্রকাশিত সংবাদ তাঁকে আমি দিয়েছি, তিনি তা শুনে দুঃখিত হওয়া ত দূরের কথা, চীন সরকারকেই বার বার প্রশংসা করেছেন। চেংনাম ধনী, কিন্তু শিক্ষার লেশও

লোকটির নেই। শুনুন আমি বলছি চেংনাম যত টাকা চীন দেশে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন তার দ্বারা দরিদ্রের উপকার হবে না, হবে দরিদ্রের সর্বনাশ। আপনি যখন চীন দেশে যাবেন তখন দেখবেন কত দরিদ্র লোক বিনা অপরাধে কুকুর বিড়ালের মত নিধন হচ্ছে। এখন এসব কথা থাক্, আমরা চাই আপনি তাড়াতাড়ি চীন দেশে চলে যান এবং তথায় গিয়ে চীনের ঘটনাবলী দেখে বই লিখুন এবং পৃথিবীর লোক আপনার অভিজ্ঞতা পাঠ করে চীনের স্বরূপ বুঝুক। চীন দেশে ভ্রমণ যাতে সুচারুরূপে হয় সেজন্য আপনাকে দুখানা পত্র দেওয়া হবে। এই পত্র দুখানা আপনি লুকিয়ে রাখবেন, কাউকে কোন মতেই দেখাবেন না। চীন দেশে গেলে পরে যার কাছে পত্র লেখা হয়েছে সেই এসে চেয়ে নিয়ে যাবে। ভদ্রলোকের কথাগুলি আমার মনে বেশ দাগ কেটেছিল। চেংনামের কথার ভেতর দিয়ে তিনি সোজা কথায় যেন তথাকথিত কৃতকর্মা, বদান্য, সদাশয় বড়লোক শ্রেণীটারই স্বরূপ খুলে দিলেন। আমার চিরাচরিত মনোজগতেও একটা মস্ত আলোড়নের সৃষ্টি হল। একটা নতুন দৃষ্টিভংগি নিয়ে নতুন ভাবে দুনিয়াটা দেখা প্রয়োজন ক্রমেই উপলব্ধি করতে লাগলাম। চেংনাম সন্দর্শনের চেষ্টাও একেবারেই মিটে গেল।

পত্র দুখানার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন তা অতি সোজা এবং চমকপ্রদ। নিশ্চয়ই পত্র দুখানার সম্বন্ধে অন্য কেউ জানবে এবং আমার কাছে এসে চাইবে। চীন দেশের সংগে এঁদের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে এবং এঁদের কোন প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই আছে যার সংগে পৃথিবীর অনেক স্থানের সম্বন্ধও রয়েছে। এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যখন রাষ্ট্র-বিপ্লবের সম্ভাবনা হয়। চীন দেশের কমিউনিষ্টরা নতুন করে রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন সে কথা আমি জানতাম না। চীন দেশের

ডাকাতের কথাই শুধু শুনতাম আর ভাবতাম এমন ডাকাতপূর্ণ দেশে কি করে ভ্রমণ করব। চীন দেশের সংবাদ তখনকার দিনে বিদেশে আসত না। সেজন্যই সে সময়ে চীন দেশ সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কিছুই জানত না। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের দ্বারা পরিপুষ্ট লেখকগণ চীন দেশ সম্বন্ধে শুধু বদ কথাই রটনা করেছে। তারই ফলে চীনের অনেক কথা যা সর্বসাধারণের দরকার তাও অবগত হওয়ার সুযোগ এবং সুবিধা পেতুম না। প্রপাগাণ্ডার ফলে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলেই গ্রহণ করেছি।

আসার সংগে যাওয়ার নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। এখানে এসেছি, এখান হতে আমাকে বিদায় নিতে হবেই। কাল সকাল এখান থেকে বিদায় নেবো। সকাল বলতে আমরা সূর্যের উদয় বুঝি, কিন্তু আমার সকালবেলা হল গভীর রাত্রি। রাত্রেই আমি চলি। বিদায়ের পূর্বে ডাক্তার এসে আমার সংগে দেখা করে বললেন, এসময়ে যদি কিয়াংসী প্রদেশে পৌঁছতে পারতেন তবে অনেক কিছু দেখতেন। কোথাও বেশীদিন বিশ্রাম না করে তাড়াতাড়ি চীন দেশে চলে যান। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার মতে যে অজানিত শক্তি পৃথিবীর সুখ দুঃখের কারণ হয়ে রয়েছে তা একদম বাজে কথা। চীন দেশের কিয়াংসী এবং হোনান প্রদেশে গেলেই বুঝতে পারবেন মানুষের অতি লোভই যত দুঃখ কষ্টের কারণ। অতি লোভীদের দমন অথবা নাশ করার উৎযোগের ফলেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের শুরু হয়েছে এবং যেদিকে সোভিয়েট স্থাপন হয়েছে সেখানেই কিরূপে লোক সুখে জীবন-যাপন করছে তা বিশেষ করে দেখতে পারেন। ডাক্তারের সংগে দুদিন আলাপ করেই বুঝতে পারলাম ন্যাশানালিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট চীনাদের মাঝে কত প্রভেদ। ন্যাশানালিষ্ট চীনারা মেয়ে পুরুষ সকলেই আমাদের মত রক্ষণশীল। তারা

পৃথিবীর অন্যান্য জাতের মানুষকে মানুষ বলে এখনও ভাবে না। তাদের পুরাতন চালচলন, তাদের পুরাতন পোষাক, তাদের পুরাতন চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। যদিও ডাক্তার স্যুন্-ইয়াৎ-সেনের শিক্ষায় মেয়েরা লোহার জুতা এবং পুরুষরা বেণী কেটে ফেলেছে তবুও তাদের মাঝে এমন সব বদখত ভাব রয়েছে যার ফলে এখনও তারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার কবল হতে মুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। রাসায় ডাক্তার অকাতরে সকলকেই সেবা করেন। ডাক্তারের স্ত্রী একটি সমিতি করেছিলেন। সেই সমিতিতে সকল জাতেরই প্রবেশের অধিকার ছিল। তাঁর আন্তর্জাতিক মনোভাব এবং কার্যকলাপের ফলে তিনি মালয় দেশে অচীনাদের কাছেও দেবী বলেই পরিচিত হয়েছিলেন।

একই মাটি, একই জাত কিন্তু ন্যাশানালিষ্ট এবং সোসিয়ালিষ্ট চীনাতে কত তফাৎ! সাদাচীন আর লালচীনের কথা ভাবতে ভাবতে হংকং-এর দিকে রওনা হলাম।

অপরিচিতের হাতে

আমাদের দেশে অনেকেই কি করে সাইকেলে করে পৃথিবী ভ্রমণ করতে হয় তা জানেনা। আমিও জানতাম না। কিন্তু কতকগুলি বৈদেশীক পর্যটকের সংশ্রবে এসে আমি অনেক কিছু জেনেছিলাম। সাইকেলে যাঁরা ভ্রমণ করতে চান তাঁরা যেন সাদাসিধে ভাবে চলেন। বহুরূপী সাজলেই বিপদ আপদ ত আছেই উপরন্তু কিছু না জানারই সম্ভাবনা বেশী। আমি বহুরূপী সাজ্তাম না, এমন কি আমার রিষ্টওয়াচও অনেক সময় বুক পকেটেই রাখতাম। সিংগাপুর হতে যে ঘড়িটা আমার সংগে ছিল সেটা সময় ঠিক দিত না। ঠিক-সময় রাখার আমার দরকার হয়ে উঠল। শীতের সময় চীন দেশের আকাশে সূর্য কমই দেখতে পাওয়া যায়। কখন কুয়াশা কখন শীলাবৃষ্টি আবার কখনও বা আকাশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। হংকং-এ কয়েকদিন থাকার পরই অনুভব করলাম ঘড়িটা বদলাতে হবে, নতুবা কখন সকাল হল আর কখন বিকাল হল জানতে পারব না। অর্থাভাব আমার খুবই ছিল তবুও কয়েকটা বড় বড় ঘড়ির দোকান ঘুরলাম। বড় দোকানে ঘড়ির দাম শুনে ঘড়ি কেনার ইচ্ছা একদম লোপ পেল, তাই পুরাতন ঘড়ির দোকানগুলিতে ভাল ঘড়ি কম দামে পাওয়া যায় কিনা দেখতে লাগলাম। কিন্তু ঘড়ি কেনা আমার হল না। পরের দিনও আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে বইছিল। হোটেল থেকে বের হতে মোটেই ইচ্ছা করছিল না। সকালের সংবাদ পত্র পাঠ করেই সময় কাটাচ্ছিলাম। নির্জনতাও বেশ অনুভব কর-

ছিলাম। ভাবছিলাম যদি কেউ আসত তবে কথা বলে সময় কাটান যেত। এমনি সময় একজন লোক আমার রুমে প্রবেশ করে কাছের চেয়ারটা আগুনের কাছে টেনে নিয়ে আমার দিকে না চেয়েই বললেন—নমস্কার মিঃ লিমনাথ, আপনার ঘড়ি কেনা হয়নি জেনে বড়ই দুঃখিত হলাম। ঘড়ি কেনা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আপনার ঘড়ি কেনার দরকার হবে না। সময়ের সঠিকতা জানার জন্যই আপনি ঘড়ি কিনতে চান তা আমরা বেশ ভাল করেই বুঝি। আপনাকে সময় ঠিক রাখবার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। ভাল কথা, আপনি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন জানতে পারি কি? প্রশ্নটা শুনেই আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল। যার যথায় অভাব সেই অভাবের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করলে বড়ই লাগে, আমারও লেগেছিল। রাগ সম্বরণ করে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি তা জানা আপনার কি দরকার? লোকটি আগুনের দিকে মুখ রেখেই বললে—দরকার বই কি? আপনি আমাদের দেশে ভ্রমণ করতে যাবেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব, তাই আপনার বিদ্যাবুদ্ধির সন্ধান পেলে সুবিধা হবে না কি?

আমি পল্টনে বড় বাবুর কাজ করেছি। সিংগাপুরে বড় একটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছি বিশ্বরূপ দেখতে আর ভাবপ্রবনতার চরমত্ব অনুভব করতে, এর বেশী আমার আর কোন মতলব তখন এই ভ্রমণে ছিলনা। সুতরাং আমার বিদ্যা বুদ্ধি কতটুকু সে প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না। লেখা পড়া মানে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ? লোকটা কি বলতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হলে চীন ভ্রমণ আমার হবে না? এসব চিন্তা করে আমার ভয়ানক রাগ হল। আমি চুপ করে থাকলাম কতক্ষণ। তারপর বললাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আমার নেই। লেখা পড়া আমি অতি অল্পই করেছি। আমার মত/নাম

গোত্রহীন লোককি আপনাদের দেশে গিয়ে কোন পাত্তাই পাবে না? যদি আপনাদের মত বিদ্বান লোকের সংগে মেলামেশার সুযোগ না পাই অথবা সাহায্য আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব না হয় তবে চীন দেশে অনেক গরীব এবং অশিক্ষিত লোক আছে, তাদের সংগেই থাকব। আমি আর মাত্রা ঠিক রাখতে পারছিলাম না কারণ চীনও আমাদের মতই পরোক্ষভাবে 'কলোণিয়াল' দেশ তখনকার দিনে ছিল। ভাবছিলাম এদের ভেতরেও পরাধীনতার দোষ এসে পড়েছে, তাই একদম বলে ফেললাম—এখান হতে বের হয়ে গেলে বাধিত হব, আমি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরীক্ষা আপনার কাছে দেব না।

আমি যখন চিৎকার করে কথা বলছিলাম তখন বয় এবং ম্যানেজার উভয়েই আমার ঘরে একই সংগে প্রবেশ করলেন। বয় এসেছিল চা এবং ফল নিয়ে এবং ম্যানেজার আসছিলেন হাসতে হাসতে দুপাটি দাঁত বের করে। বয় চা এবং ফলের ট্রে টেবিলে রেখে বের হয়ে গেল। ম্যানেজার আর একখানা চেয়ারে বসে আগনতুক লোকটিকে নমস্কার করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হয়েছে মিঃ লিমনাথ? আমি বললাম—কি আর হবে, ইনি এসেছেন আমার বিদ্যা কতটুকু ওজন করে দেখতে। বলুন ত আপনি কি পাশ করেছেন?

ম্যানেজার বললেন—এখানে পাশ অথবা ডিগ্রীর কথা হচ্ছে না, আপনি বিদেশে ভ্রমণ করতে এসেছেন, আপনাকে অনেক কথা জানতে হবে এবং সেই কথা দেশ বিদেশের লোককে জানাতে হবে। জানাতে হলেই জানবার ক্ষমতা অর্জন করা দরকার। আপনার জানার ক্ষমতা আছে কিনা তাই ভদ্রলোক জানতে চান। তিনি আপনার বন্ধু, শত্রু নন। আমিও আপনার বন্ধু। আপনাকে আমরাই

হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। ঐ যে শিখটি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সে আমাদেরই লোক। সে আপনাকে চিনেনা বলেই ভান করেছিল। X সে আপনার জন্য বিকালে তিনটা হতে অপেক্ষা করেছিল। আপনি জাহাজ হতে নামলেন রাত এগারটায়। ওয়ারলেশ অপারেটার আপনাকে শিখলোকটির সংগে যেতে বলেছিল। অপারেটার আমাদের লোক এবং আমাদের বন্ধু। আপনার প্রতি সে সদ্‌ব্যবহার করেছে নিশ্চয়ই। হাইফং হতে সে আপনার সংগে বন্ধুত্ব করেছে। পথে পাঁখয়ে যখন কতকগুলি সেপাই জাহাজে উঠল তখন আপনি সেপাইদের দুরবস্থা দেখে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। অপারেটার তার প্রতিবাদ করেছিল এবং বলেছিল চীনের সেপাইকে সে মোটেই ভালবাসে না। এরা যদি জাহাজ ডুবে মরে তবে সুখীই হবে, এসব কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। এতেই ত বুঝতে পারছেন আপনার সম্বন্ধে আমরা কত সংবাদ রাখি।

ম্যানেজারের কথা শুনে আমার হুঁস ফিরে এল। আমি লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইলাম। ম্যানেজর বলতে লাগলেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পায়নি তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আপনার যদি কোন ডিগ্রী থাকত তবে বুক ফুলিয়ে বলতেন আপনার অমুক ডিগ্রী আছে। এসব কথা এখন থাক্, আপনাকে এখন থেকে কিছু লেখা পড়া নতুন করে করতে হবে এই হল আমাদের ইচ্ছা। কোথায় কি করে আপনার শিক্ষার ব্যবস্থা হবে তা আপনার জেনে দরকার নেই। এখন আপনি এই অপরিচিত ভদ্রলোকটির সংগে যান। তিনি আপনাকে একটি বড় ক্লাবে নিয়ে যাবেন, সেখানে অনেক লোক আপনার লেকচার শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বক্তৃতা দেওয়া তখনও শুরু করিনি। বক্তৃতা দেবার

মত আমার কিছুই ছিল না। মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন এই তিনটি মাত্র দেশ ভ্রমণ করেছি। এই তিনটি দেশের লোকের সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছি তা গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম কি বলতে কি বলে ফেলি। চা খেয়ে অপরিচিত লোকটির সংগে বের হয়ে পড়লাম। অপরিচিত লোকটির পরণে পুরাতণ ধরণের ছাতার কাপড়ের জামা এবং পাজামা, মাথায় ফেল্ট হেট, পায়ে চীনা জুতা। ভেতরে লেপের কোট। আমি পথ চলতে লোকটির পোষাকই বেশ করে লক্ষ্য করছিলাম। কুইন ষ্ট্রীট পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে অনেকদুর গিয়ে আমরা একটা বইএর দোকানে প্রবেশ করলাম। বইএর দোকানে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। দোকানটি নীচ তলায়। ওপরে আরও কয়টি তলা ছিল। আমাদের দোকানে প্রবেশের পরই দোকানী আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বলল—এই বইখানা আপনাকে আমি উপহার দিলাম। বইটার দুচার পাতা উলটিয়ে মুখে বললাম বেশ ভাল বই, অন্তরে গোপনীয় ধারণা ছিল এটা একটা বাজে বই। অর্থশাস্ত্র নিয়ে বইখানাতে নানা কথা লেখা ছিল। বইখানা হাতে করেই আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। উপরে উঠতে আমার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না কারণ সিঁড়িগুলি ছিল ছোট এবং সিঁড়িতে বাইরের আলো কমই পৌচচ্ছিল। অতিকষ্টে সিঁড়ি বেয়ে আমরা একটা রুমে প্রবেশ করলাম। সেখানে মাত্র কয়েকজন লোক বসা ছিলেন। এঁদের ছবি এবং নাম অনেক স্থানেই দেখা যায় এবং এঁদের নাম আজকাল অনেকেই উচ্চারণ করে গর্বও অনুভব করে। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন চীন দেশে গিয়ে আমি কি দেখব। আমি বললাম চীনদেশে আগে ত যাই তারপর যা চোখে পড়বে তাই দেখব। তারপর আর একজন বললেন—আপনাদের

দেশের বাড়িঘর, গরিবলোকের পোষাক এসব কি হংকংএর মতই? আমি তাদের বললাম হংকংএর গরিবলোকের সংগে আমাদের দেশের গরিবলোকের মোটেই মিল নেই। ভারতের গরিবে এবং চীনের গরিবে কোথায় প্রভেদ তার কতকটা আভাস আমার কাছ হতে প্রশ্নকর্তা পেয়েছিলেন। কি করে লোক দরিদ্র হয় তার যে-সকল কারণ আমি তাঁদের কাছে বলেছিলাম তা এখন মনে হলে আমারই হাসি পায়। আমার কথা যাঁরা তখন শুনেছিলেন তাঁরাও আজ আমি যেমন করে আমারই কথা মনে করে হাসছি তেমনি হেসেছিলেন। লেকচার মোটেই হয়নি, এসব বাজে কথা বলেই সময় কাটিয়ে হোটেলে ফিরেছিলাম।

সেদিনই বিকাল বেলা আমি একজন পরিচিত পাঠানের কাছে সকালের ঘটনা বলি, এতে পাঠান বলেছিলেন—বাবু আপনি এখন পর্যটক ছাড়া কিছুই না। দেখেশুনে পথ চলুন তবে ভয় করবেন না মোটেই। কাউকে অনর্থক রাগাবেনও না। দিকনা কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই ত। যারা পৃথিবী পর্যটনে বের হয় তারা কোন বিষয়কেই বড় করে চিন্তা করে না। এগিয়ে যান স্বাধীন চীনে, অনেক কিছু দেখতে পাবেন। দেখে শুনে শিক্ষাও হবে। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই সেজন্য আপনি দুঃখিত। যদি দেশ পর্যটন চোখ কান সজাগ রেখে করতে পারেন তবে বহু শিক্ষিত লোক আপনার কাছে অনেক কথা শিখতে আসবে। পাঠানের কথায় অনেকটা শান্তি পেয়েছিলাম। রাত্রে উভয়ে মিলে একটা রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে আমি হোটেলে ফিরে গিয়েছিলাম।

কংসী প্রথা

হোটেলে গিয়ে একদম বিছানায় লেপ মুড়ি দিলাম কিন্তু চোখ দুটা কোন মতেই বুজল না। মাথাটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছিল। নানারূপ চিন্তা মাথায় এসে জুটছিল। ঠিক করলাম হংকং-এ আর বেশি দিন কোন মতেই থাকা উচিৎ নয়। চীন দেশের ভেতরে গিয়ে যা দেখতে হয় দেখব এবং যা শুনতে হয় শুনব। পথের মাঝে এর তার কথা শুনে মনকে ঘাবরিয়ে লাভ নেই। কিন্তু এটা ঠিক করে নিলাম বড়লোকের ছায়াও মাড়াব না। তাই চীন দেশে এসেই রাসার ডাক্তারের কথামত স্বনামধন্য বড়লোক ও বড় বড় ইমারতের থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আনলাম একেবারে গরীব এবং শিক্ষিত কর্মীদের দিকে। এই ভাবে চীনের চাষী মজুর এবং শিক্ষিত কর্মীদের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখছিলাম বলেই লাল চীনের সংগে পরিচয় হবার সুযোগ এবং সুবিধা হয়েছিল। চীন, ভারতবর্ষ এবং মিশর এই তিনটি দেশেই সভ্যতা শুরু হয় সর্বপ্রথম। এই তিনটি দেশেই সভ্যতার ভাটাও এসেছে অন্যান্য জাতেরা সভ্যতার সন্ধান পাবার পূর্বেই। কালের কবলে পড়ে এই তিনটি প্রাচীন দেশই যুগের পর যুগ সজীব জীবনধারা হতে দূরেথেকে অথর্ব হয়ে পড়েছিল। যুগ-যুগান্তের পর ডাক্তার সুন্ ইয়াৎ-সেনের বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই চীনে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। চীন নবকর্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। কোয়াটাং প্রদেশ হতে শুরু করে মানচুরিয়ার মানচুলী পর্যন্ত, সিংকিয়াং প্রদেশ হতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত চীনাদের মধ্যে কাজ করবার একটা প্রবৃত্তি জাগে।

ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন চীনের রাজতন্ত্র ধ্বংস করে দিয়ে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা করে চীনে যে জাগরণ আনলেন তারি ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য একটা নতুন রূপ পেয়ে যায়। লোকেরা সমবেতভাবে কাজ করতে শুরু করে। বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা যে ধরণে ফ্যাক্টরী করে মাল উৎপাদন করছিল চীনারাও সেই অনুকরণেই চীনের অভ্যন্তর ভাগে ছোট ছোট ফ্যাক্টরী বসাতে থাকে। তাতে সুফল হল অনেক দিক দিয়েই। পূর্বে বিত্তশালী কৃষকগণ নিজের আত্মীয় এবং জ্ঞাতি ভাইদেরই নিজের কাজে নিয়োজিত করত। তাতে কৃষিকর্মের বেশ ক্ষতি হত। সাহায্যকারী আত্মীয় স্বজনকে ক্ষতি স্বীকার করেও সুখী রাখতে হত। ফ্যাক্টরী গুলিতে যেভাবে কাজ করান হত অর্থাৎ সপ্তাহে অথবা মাসে যে মাইনে দেওয়া হয় সেরূপভাবে মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। তারা বৎসরের শেষে যার যার প্রাপ্য মিটিয়ে দিত। তাই তারা এক নতুন ভাবে নিয়ম তৈরী করল যাকে বলা হয় কংসী প্রথা।

অনেকেই জাপানের কুটির-শিল্পের বেশ প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না সেই কুটির-শিল্পের স্বরূপ কি। আমি ভাবতাম জাপানের কুটির-শিল্প এক আশ্চর্য ব্যাপার। কি কারনে ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন জাপানের কুটির-শিল্পকে ঘৃণা করতেন মিঃ ওয়াং বলে এক ভদ্রলোক আমাকে তা বুঝিয়ে দেন এবং বলেন চীনে যাতে করে সেরূপ কিছু না হয় তারই চেষ্টা তখনকার দিনে সকলে মিলে করেছিলেন। মিঃ ওয়াং জাপানী কুটির শিল্প সম্বন্ধে যা বলেছিলেন জাপানে গিয়ে স্বাধীন ভাবে তা দেখে বুঝেছিলাম তা সবই সত্য। জাপানী কুটির-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মজুরদের একত্রিত হতে না দেওয়া এবং প্রত্যেক মজুরকে দিয়ে নিজের ঘরে বসিয়ে অথবা ভাড়াটে ঘরে মালিকদের ফরমাইস মত জিনিস তৈরী করান।

চাহিদা মত মাল সরবরাহ করতে যে সকল ছোট খাট যন্ত্রের দরকার হয় মালিকগণ মজুরের বাড়িতে এনে বসিয়ে দিয়ে যায়। কাঁচা মাল ঘরে এনে দেয় এবং কাজের অনুপাতে অর্থাৎ "পিশ সিষ্টেমে" মজুরী দেয়। এরই ফলে মজুরে মজুরে দেখা হয় না। কে কত পায়, কার কত পাওয়া উচিত মজুরেরা তা ধার্য করতে সক্ষম হয় না। আমি একদিন কতকগুলি মজুরের সংগে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাঁদের এটুকু সাধারণ জ্ঞান নাই যাতে করে তারা বুঝতে সক্ষম হয় ধনীর দল তাদের ঠকাচ্ছে। ন্যাশানালিজমের উগ্র মদিরা তারা এমনি ভাবে পান করেছে যে, মুনাফা, মজুরী এবং কাঁচা মালের সংবাদ রাখবার মত তাদের সময় মোটেই নেই। এসব লোকের কাছে অর্থ-নীতির কথা বলা আর আগুণে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। জাপানে যাবার পর জাপানী মজুরদের দুরবস্থার কথা নিয়ে স্থানীয় জনৈক ভারতবাসীর সংগে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তিনি জিভ কেটে এসব কথা বলতে মানা করেছিলেন। আমিও তাঁকে এসব কথা বলে বিপদে ফেলতে চাইনি।

জাপানী মজুর থাকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এক খানা ছোট ঘরে। সেই ছোট ঘরেতেই ছোট ছোট মেশিন বসিয়ে দেওয়া হয়। মজুরের স্ত্রী পুত্র কন্যা এমনকি শিশুরা পর্যন্ত যখনই সময় পায় তখনই পিতার সাহায্য করে এবং সত্বর কনট্রাক্টের কাজ শেষ করে নতুন কাজ পাবার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। পরিবারের সবাই জানে নতুন কাজ পেলে আরও টাকা পাওয়া যাবে। নতুন কাজ পাবার জন্য অপেক্ষা করাটাই হল পরিবারের আনন্দ এবং যতদিন কাজ না আসে ততদিন মজুর আর তার পরিবারের লোক আরাম করে দিন কাটায়। কথনও তারা চিন্তা করে না এই আরাম তাদের প্রাপ্য। তারা ভাবে এটা তাদের

একটা সৌভাগ্য। যে কয়টা দিন আরাম করা যায় তাই লাভ। জাপানী ধনীরা সেই শ্রমজাত কুটির-শিল্প বিদেশে পাঠিয়ে আর অর্থ সংগ্রহ করে। এর বেশী কর্তব্য তাদের নেই বললেও চলে। জাপানী মজুরদের মত কলুর বলদ চীনারা যাতে না হয় তাই ছিল ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেনের লক্ষ্য। কংসী বা সর্দার প্রথায় মজুরেরা এক সংগে থাকে, সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পায়; মজুর শ্রেণী নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং প্রেরণা পায়। জাপানী কুটির-শিল্পের মজুরেরা আলাদা আলাদা থাকে বলে সংগঠনের কথা, শ্রেণী লড়াইয়ের কথা ভাবতেই পারে না। ধনিক শ্রেণীর সংগে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনার এবং সমাজে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পেতে পারে না। চীনারা জাপানী প্রথায় কুটির-শিল্পের প্রতিষ্ঠান না করে সংঘটন এবং সংগ্রাম করার সুযোগ এবং সুবিধা পেয়েছে এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ভারতে এসে বার বার আমি সেই কথাই বলেছি। হয়ত কেউ কেউ আমার কথা শুনেছেন, হয়ত কেউ বা অবজ্ঞা করে কথা উড়িয়ে দিয়েছেন।

চীন জাপানের প্রতিবেশী। চীনারা জাপানকে যেমন চিনতে পেরেছে আমরা তেমন করে জাপানকে এখনও চিনতে পারিনি। সেজন্যই চীনারা কুটির-শিল্পের দিকে না ঝুঁকে কংসী প্রথায় শিল্প এবং কৃষিকার্যের সংস্কার করতে শুরু করেছিল।

কংসী প্রথা মানে সকলে মিলে কাজ করে যা উৎপাদন হয় তা সকলে মিলে ভাগ করে ভোগ করা। এই হল যার গোড়ার কথা তার প্রকৃত স্বরূপ কিন্তু গিয়ে দাঁড়াল অন্যরকম—অনেকটা আমাদের দেশের সর্দার প্রথার মত। আমাদের দেশে আইনমতে সর্দারগণ ফ্যাক্টরী হতে অধীনস্থ মজুরের মাইনে নিয়ে আসতে পারে না। মজুররাই স্ব স্ব মাইনে নিয়ে আসে। কিন্তু মাইনে নিয়ে এসে

মজুররা স্বগৃহে যায় না, একদম চলে আসে সর্দারের ঘরে। অবশ্য এতে প্রত্যবায় নিশ্চয়ই আছে তা আমাকে বলতেই হবে, কিন্তু এমন কজন মজুর আছে যে সর্দারকে অবহেলা করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়? চীনদেশে কিন্তু তা হল না। সর্দার যে-কোন কাজ চুক্তি-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মালীকের কাছ হতে সংগ্রহ করে, নিজের অধীনস্থ লোক দিয়ে সেই কাজ করাতে লাগল। ধনীর সংগে সর্দার কিরূপ চুক্তি করল তা নিয়ে শ্রমিকরা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করত না। কলুর বলদের মত তাদের শুধু খেটে যাওয়াই ছিল কাজ। কাজের বদলে তারা পেত খাওয়া, মামুলী পোষাক এবং সন্ধ্যার সময় হাত খরচ বাবত দুএক আনা পয়সা। প্রকৃতপক্ষে কংসী প্রথা প্রচলনের ফলে চীনদেশের লোক চারশ্রেণীতে বিভক্ত হতে লাগল—যথা ধনী, সর্দার, মজুর এবং গ্রামের বেকার।

কংসী প্রথার প্রথম অবস্থাতেই স্বরূপ বদলে গিয়ে শুরু হল সর্দার প্রথা। সমবায়ের নামে শুরু হল শোষণ। আর এই শোষণ প্রথারই প্রশংসা চারদিকে প্রচার হতে লাগল। বৈদেশিক মিশনারী এবং ডিপ্লমেটরা এটাকেই ডিমক্রেসী বলতে লাগলেন। অন্যায়ের সৃষ্টি হতে লাগল। পুঁজিবাদের কলেবর বড় হতে লাগল। সময় এবং সুযোগ পেলে পুঁজিবাদের এমনি করেই বৃদ্ধি হয়। অনেকে এই নিয়মটিকে হটাতে গিয়ে নিজেই পুঁজিবাদী হয়ে গেছেন। বিধাতার নিয়ম বলে পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছেন। পুঁজিবাদ হতে রক্ষা পাবার জন্য অজানিত এক শক্তির কল্পনা করে তারই হাতে সব ছেড়ে দিয়েছেন। চীন দেশে কিন্তু তা হল না—সময় ও সুযোগের কল্যাণে মত এবং পথ বদলে গেল। ধনতন্ত্রবাদের গোড়ার কথা অনেকে জেনেছিলেন বলেই পুঁজিবাদের গোড়া কাটার ব্যবস্থার জন্যই তাঁরা উঠে পড়ে লেগে যান।

সভ্যতার বিস্তার এবং হঠাৎ তার গতিরোধ নানা কারণে হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদ তার একটি মস্ত কারণ। পশ্চিমের নতুন জাতগুলি ক্রমে যখন গরু ছেড়ে ঘোড়া ব্যবহার করতে শুরু করল, তাদের কাজ যখন এগিয়ে চলতে লাগল, চীনারা তখন মানুষের শক্তিকেই কৃষিকর্মে ব্যবহার করছিল। তার কারণ হল—চীনদেশে গরুর সংখ্যা খুবই কম। উত্তর চীনে ঘোড়ার সাহায্যে হাল চাষ করা কথন যে প্রচলিত হয়েছে তা নিয়ে যদিও মতের গরমিল আছে তবুও ঘোড়ার প্রচলনের প্রথাকে কেউ একশত বৎসরের বেশি পুরাতন বলে স্বীকার করেন না। উত্তর চীন আমি ভাল করেই ভ্রমণ করেছি। আমি দেখেছি এখনও অনেক স্থানে ঘোড়া দিয়ে হাল চাষ করা হয় না। মজুর কোদালের সাহায্যেই মাটি কোপায় এবং মানুষের শক্তিকেই মই দেবার কাজে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ চীনের অবস্থা হাল চাষের দিক দিয়ে আরও খারাপ। কচিৎ দেখতে পাওয়া যায় মোষের সাহায্যে হাল দেওয়া হচ্ছে, নতুবা সর্বত্র সেই সনাতন প্রথা—মানুষের শক্তিকেই হাল চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে করে হাল চাষে মজুরের দরকার হয় বেশি। পূর্বেই বলেছি জ্ঞাতি কুটুম্ব নিয়েই হাল চাষের কাজ চলত। কংসী প্রথা প্রচলিত হবার সংগে সংগে জ্ঞাতি কুটুম্বের দায় হতে রক্ষা পাবার জন্য সকলেই সর্দার ডেকে আনতে লাগল। নিকটস্থ জ্ঞাতি কুটুম্বরা যে কাজ করত সেই কাজ অপর লোক কেড়ে নিল। যারা বেকার হল তারা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র কাজের খোঁজে বের হয়ে গেল। অন্যান্য বেকারগণ ভাবতে লাগল, তাইত এ আবার হল কি? শুধু চিন্তা করলে চলবে না, ক্ষুধার সময় ভাতের দরকার হয়ই। যখন ক্ষুধার আগুন জলে উঠে তখন অনেকেই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন নানা অসৎ কাজে মন আপনা হতেই ধেয়ে যায়। কৃষিকার্যও বৎসরের সকল

সময় হয় না। শীতের সময় কোথাও কোথাও কৃষিকাজ একদম বন্ধ থাকে। কোথাও বা গরমের সময় শস্য না পাকা পর্যন্ত মজুরদের বেকার বসে থাকতে হয়। এসব কারণেই সাময়িক বেকার এবং স্থায়ী বেকারে চীনদেশ ছেয়ে যায়। চীনারা কিন্তু অলসভাবে বসে থাকতে কখনও ভালবাসে না। যদিও বর্ধিত বেকারের সংখ্যা চীনের পক্ষে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তথাপিও যাঁরা চীনের কর্ণধার ছিলেন তাঁরা এবিষয়ে একটুও মাথা ঘামালেন না। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন আগেকার দিনে যেমন করে কিছু ঘটত এবং তার প্রতিক্রিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আপনা হতে আপনি লয় পেয়ে যেত এবিষয়েও সেরূপই কিছু হবে। কিন্তু সময় বদলে গিয়েছিল। এর ফল খারাপের দিকেই চলল।

বেকার মজুর অনেকেই সেপাই-এর কাজ করাটা মোটেই পছন্দ করত না। সেপাইদের যা মাইনে দেওয়া হত তা অতি সামান্য ছিল এবং তারা যে সকল ধনদৌলত লুটে নিয়ে আসত তাতে তাদের ভাগ বসাবার অধিকার ছিল না। এতে করে অনেকেরই সেপাই হবার উদ্দীপনা অংকুরেই লোপ পেত, সেপাই-এর কাজ পরিত্যাগ করে স্বাধীন-ভাবে ডাকাতি করবার প্রবৃত্তি আপনা হতেই অনেকের মনে জেগে উঠত। যারা একটু সাহসী তারা স্বাধীনভাবে ডাকাতের দল গঠন করত। এতে কেউ সফল হত কেউ হত না। চীনদেশে ডাকাতি করাটাও কাজ কর্মেরই অন্তর্গত, সেজন্যই ডাকাতিকে কেউ অপকর্ম না বলে "চোকং" অর্থাৎ কাজই বলত। এরূপ কাজ করতে গিয়ে অনেকে মারাও যেত—বাড়িতে ফিরে আসতে হতো না। এসব লোকের সন্ধান নেবার জন্য কেউ যদি আসত তবে তাকে বলা হতো লোকটা স্বগ্রামে চলে গেছে। "হো থংসান লা"—আমরা যাকে স্বর্গ বলি স্বগ্রামকেই চীনারা তাই ভেবে থাকে।

বেকার পুরুষের দল ত ডাকাতি অথবা সেই ধরনের কিছু করে জীবন রক্ষা করতে লাগল, এখন বেকার মেয়ের জাত বেঁচে থাকবার জন্য কি করতে পারে তাও বিবেচ্য বিষয়। তাদেরও একটা সোজা পথ মিলে গিয়েছিল যাকে বলা হয় গণিকাবৃত্তি। চীনারা গণিকা-বৃত্তিকে বড়ই হীন কাজ মনে করে। জাপানীরা এবিষয়ে আবার চীনাদের একদম উল্টো। তারা গণিকাবৃত্তিকে খারাপ কাজ মোটেই মনে করে না। জাপানীরা আবার চীনাদের মত দুটি তিনটি স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে রাজি নয়, এক স্ত্রীর বেশি জাপানীরা ঘরে রাখে না। চীনা বেকার স্ত্রীলোকেরা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করায় অনেকেরই টনক নড়ে গিয়েছিল তা আমি বেশ ভাল করেই অনুভব করেছিলাম। সংযমী লোক অনেক সময় আমার কাছে এসে এবিষয়ে উপদেশও চাইতেন। আমার উপদেশ দেবার মত কিছুই ছিল না। পুঁজিবাদ যেখানে বাড়তে থাকে সেখানেই ব্যভিচার এসে দেখা দেয়। পুঁজিবাদের প্রবল অত্যাচার হতে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই ডাক্তার স্থন্-ইয়াৎ-সেন 'জনগণের ত্রি-নীতি' (Three Principles of the People) প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু একবার যেখানে পুঁজিবাদ গড়ে উঠে সেখানেই পুঁজিবাদ সকল বাধাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আপন স্বরূপ ধারণ করে। পুঁজিবাদ গড়বার জন্যও দেশ-কাল-পাত্রের দরকার হয়। চীনদেশের কংসী প্রথা পুঁজিবাদ গড়বার পক্ষে সাহায্য করছিল। কিন্তু সংগে সংগে পুঁজিবাদ যে সমাজের শত্রু তা চীনের লোক ডাক্তার স্থন্-ইয়াৎ-সেনের শিক্ষাপদ্ধতির অনুকম্পায় বেশ ভাল করেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। জাপানের লোক সেরূপ শিক্ষা পায়নি বলেই মামুলি ধরনের কুটির-শিল্পে মত্ত থেকে ন্যাশানালিজমের মদিরা পান করে ধরাকে সরা জ্ঞান করে নিরস্ত্র চীনের ওপর আঘাত হেনেছিল।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরাও সে দোষ হতে বাদ যায়নি। এতে চীনের জনগণের মধ্যে জাগরণই হচ্ছিল। চীনের ঘরে বাইরের শত্রু শুধু চীনের জাতীয় উন্নতিই এনে দেয়নি, একটি নতুন ভাষাও নতুন জাতের সুবিধার্থে এনে দিয়েছিল, এখন তারই কথা বলছি।

মেন্‌ডেরিন ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে আমি বলতে বাধ্য হব চীনের ছাত্র এবং ছাত্রীরা যেমনভাবে প্রাদেশিকতা ভুলতে সক্ষম হয়েছিল তেমনটি আর কেউ পারেনি। ক্যাণ্টনের লোক পিকিনের লোককে বলত "পিকিন কুইয়া" আর পিকিনের লোক ক্যাণ্টনের লোককে বলত "কেন্‌তন কুইয়া"। 'কুইয়া' শব্দটির সঠিক মানে হল বর্বর, যদিও সোজা ভাবে ভূতই বুঝায়। একে অন্যকে পশুর চেয়েও ঘৃণা করত। ক্যাণ্টনের লোক সর্বদাই অগ্রণী হয়ে বিদ্রোহ করত, পিকিনের লোক সর্বদাই চুপ করে বসে থাকত। কিন্তু যখন সাধারণ ভাষার সন্ধানে লোক বের হল তখন পিকিনের ভাষাই গ্রহণ করতে বাধ্য হল। প্রয়োজন ঘৃণাকে চীন সাগরে নিক্ষেপ করল। চীনের ছাত্রসমাজ বিপ্লব আনার জন্য যতটা স্বার্থত্যাগ করেছে, আমার মনে হয় পৃথিবীর আর কোন ছাত্রসমাজ ততটা করেনি। এ বিষয়ে আমার ভুলও হতে পারে কারণ অন্য কোন দেশের বিদ্রোহের ইতিহাস আমি বিশেষ পাঠও করিনি, চক্ষেও দেখিনি।

মেন্‌ডেরিন ভাষা

কংসী প্রথা এবং তার পরিণতিকে কেউ ডেকে নিয়ে আসেনি। কংসী প্রথা চীনের দরজায় এসে ধাক্কা দিয়েছিল এবং চীনদেশের দরজা খুলে গিয়েছিল। এর ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের অংকুর গজিয়েছিল। আমার মনে হয় এই দুটি ভাবধারাকে সাহায্য করার জন্য মেন্‌ডেরিন ভাষার দরকার চীনারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। যখন কিছুর দরকার অনুভূত হয় তখন সে জিনিসটা এসে যায়ই। মেন্‌ডেরিন ভাষা এসে ত গেলই উপরন্তু হুহু করে বিস্তার লাভ করতে লাগল। মেন্‌ডেরিন ভাষা একা এল না, সংগে করে নিয়ে এল জাতীয় একতা এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রবল বাসনা। শিক্ষা আবার একটা প্রকাণ্ড দাবানল, যেদিকে যায় সেদিকেই পুরাতনের পুঞ্জীভূত পঙ্কিলতাকে পুড়ে ছাই করে দেয়। শিক্ষার আলো পেয়ে চীনাদের ভেতর শ্রেণীচেতনা জেগে উঠল এবং মানসিক উন্নতিও শুরু হল।

প্রথমে ছিল কংসী প্রথা, তার পরে এল মেন্‌ডরিন ভাষা। এ দুটোকে কেন্দ্র করেই চীনের অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি এবং সংস্কৃতির একতার বনিয়াদ গড়ে উঠল। ন্যাশানালিস্ট নেতাদের প্রচেষ্টায় চীনে যেমন উন্নতি হতে শুরু হল অন্য দিকে কমিউনিস্টরা শ্রেণীগত ভেদাভেদ বিবাদ দূর করে সংগে সংগে অখণ্ড সমাজ-চেতনাও এনে দিয়েছিল। এতে লাল চীনের গোড়া পত্তন হচ্ছিল বেশ ভাল করেই। আমার মত অশিক্ষিত লোকের চোখেও এসব বিষয় বেশ ভাল করেই ধরা পড়েছিল অথচ

বৈদেশিক লেখকগণ কেন যে এসব বিষয় তখনকার দিনে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তার কারণ নির্দেশ করা বড়ই কঠিন। তাঁরা শুধু চীনারা ডাকাত আর চীনারা কুখাদ্য খায় এ কথাই আমাদের জানাতে চেষ্টা করছিলেন। চীনের সত্যিকারের ডাকাতগণ মেন্‌ডেরিন ভাষার প্রচলনের দরকার হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিল। ১৯২১ সাল হতেই চীনদেশে নানারূপ রাষ্ট্রবিপ্লব এসে দেখা দেয়। অন্ন বস্ত্রের অভাব হয়। চীনারা বড়ই চন্‌চল। তাই তারা এক স্থানে স্থির না থেকে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগল খাদ্যের সন্ধানে—জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। চীনারা চুরি করাটা ভয়ানক ঘৃণা করে। ডাকাতি তাদের কাজেরই অন্তর্গত ছিল। ডাকাতি একাকী হয় না। দল পাকাতে হয়। ডাকাতের দলে সকল প্রদেশের লোকই থাকত, কিন্তু একে অন্যের সংগে কথা বলতে পারত না। কেণ্টনিজরা সকল সময়ই তাদের কথ্য ভাষার প্রাধান্য দিত। কিন্তু এরূপ প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে যদি নিজে কর্তা হওয়া যায়। সকল সময় তাদের কর্তা হবার সুবিধা হতো না তাই তারাও এমন একটা ভাষার সন্ধান করতে লাগল যা অপরকে সহজে বুঝান যায়। মেন্‌ডেরিন ভাষার কথা আপামর সকলেই শুনেছিল। ডাকাতগণও সেই ভাষার সাহায্য নিতে লাগল। কোন ভাষা না শিখলে তার সাহায্য পাওয়া যায় না। একদিকে ডাকাতি অন্যদিকে ভাষা শিক্ষা কম কথা নয়। মেন্‌ডেরিন ভাষায় যত বই ছাপা হয়েছিল তার প্রায়ই ধনতন্ত্রবাদ নিয়ে। এতে করে ডাকাতদের একদিকে আধুনিক যুগের ধনতন্ত্রবাদ অপর দিকে মেন্‌ডেরিন ভাষা এবং তাদের নিজেদের পেশা, এই তিনটায় মিলে তাদের উন্নতির দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে গোড়ায় কিন্তু রয়ে গেল মেন্‌ডেরিন ভাষা।

চীনাদের কথ্য ভাষায় এবং লেখ্য ভাষায় ভয়ানক প্রভেদ রয়েছে। একই দেশের এক অন্‌চলের লোকের কথা অন্য অন্‌চলের লোক মোটেই বুঝতে পারত না। এদিকে লেখার ভাষা সর্বত্র সমান। মনের ভাব লেখার ভাষায় বললেও কোন লাভ হতো না। তার কারণ বুঝতে আমরা একটু বেগ পাব। আমাদের অক্ষর আছে। আমাদের অক্ষরের উচ্চারণে একটু আধটু প্রভেদ হতে পারে, কিন্তু বই-এ ছাপা শব্দ যখন আমরা পড়ি তখন সকলেই একই ভাবে উচ্চারণ করি। চীনে তা হয় না। চীনাদের অক্ষর নাই, আছে শুধু শব্দ। এক একটি শব্দ এক একখানা ছবির মত। সেই ছবিগুলি যে যেমন করে পারে তেমনি করে উচ্চারণ করে, কিন্তু যখন লেখে তখন একে অন্যের মনের ভাব বুঝে অর্থাৎ ছবিগুলোতে যা বুঝায় তাই ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। চীনাদের লেখ্য ভাষা জাপানী এবং কোরিয়ানরাও বুঝে। আমরা যেমন পরিভাষা সংস্কৃত হতে নেই, জাপানী এবং কোরিয়ানদের পরিভাষার দরকার হলে চীনা ভাষা হতেই শব্দ সংগ্রহ করে। এমনি ধারার উচ্চাংগের ভাষা যদি পরস্পরে না বুঝে তবে দুঃখ হয় না কি?

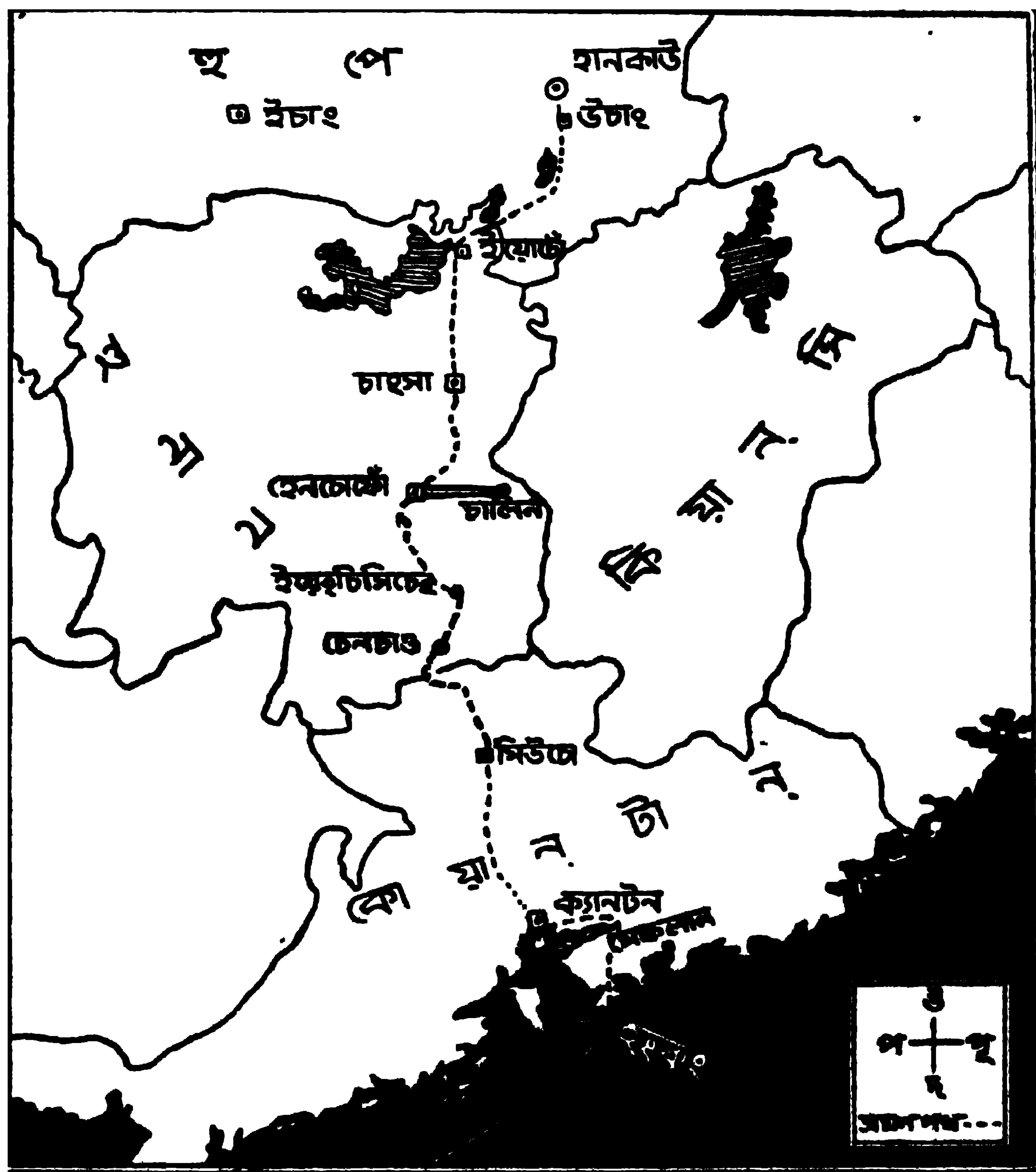
নতুন শিক্ষিত চীনারা সে দুঃখ অনুভব করেছিল বলেই সাহিত্যিকরা সকল রকমের দলাদলি, প্রাদেশিকতা এবং আপন আপন মতলব ভুলে গিয়ে মেন্‌ডেরিন ভাষার প্রচলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় গ্রামে গ্রামে এক ধরনের নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। শিক্ষকগণ আধুনিক ধরনে শিক্ষিত। এই নব্যশিক্ষিত শিক্ষকেরা মেন্‌ডেরিন ভাষায় কথা বলতেন। গ্রামের লোক তাঁদের কথা অতি অল্প সময়েই বুঝতে সক্ষম হতো। গ্রামে গ্রামে এই নতুন ভাষা শিক্ষার ভেতর দিয়েই নব জাগরণের শুরু.

হয়েছিল। এই নব্যশিক্ষিত শিক্ষকরা শুধু মেন্‌ডেরিন ভাষা শিক্ষা দিয়েই চুপচাপ বসে থাকতেন না, তাঁদের চিন্তা ধারাও ছিল অভিনব। তাঁদের কথার মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণ ছিল এবং তাঁদের বলার বিষয়বস্তু এমনই চমকপ্রদ ছিল যে সকলেই তা শুনতে ভালবাসত। এরূপকরে ক্রমে ক্রমে সর্বসাধারণের মন একটা নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে লাগল। দেশের প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং সনাতনীর দল মেন্‌ডেরিন ভাষা শিক্ষার সংগে নানারূপ 'পাপ' সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করেছে দেখে কেঁপে উঠল। ছাত্রসমাজ কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। শিক্ষিত যুবক যুবতী মেন্‌ডেরিন ভাষার মারফতে মজুরদের তাদের প্রাপ্য মজুরী দাবী করতে শিক্ষা দিচ্ছিল। মজুররা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল এবং প্রাপ্য মজুরীর জন্য সংগ্রাম করবে বলে হুমকী দেখাচ্ছিল। কৃষক মজুররা অত্যাচারী কংসী সর্দারদের সায়েস্তা করতে কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছিল। মেন্‌ডেরিন ভাষার এরূপ 'অশুভ ফল' দেখে, যাতে করে নতুন ভাষা মেন্‌ডেরিন আর প্রচলিত না হয় প্রতিক্রিয়াশীলরা তার চেষ্টা করতে লাগল। প্রতিক্রিয়াপন্থীগণের কুপ্রচেষ্টার ফলে গ্রামের মধ্যেই এক দলের সংগে অন্য দলের সংঘর্ষ হতে লাগল। সংঘর্ষের ফলে অর্থক্ষয় এবং লোকক্ষয় হতে লাগল। পরিণামে দেশে বিদ্রোহ নতুন রূপ নিয়ে এসে দেখা দিল। আমি চীনদেশে পৌঁছেছিলাম সেই সময়েই। 'মরণ বিজয়ী চীন'-এ সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

চালিনের পথে

চালিন হুনান প্রদেশের প্রসিদ্ধ গ্রাম। চীনের লোক এই গ্রামের নাম শুনে কেউ বা আনন্দিত হতো আর কেউ বা ভয়ে কাঁপত। গ্রাম গ্রামই। এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে যেতে কখনও বেগ পেতে হয় না, কিন্তু চালিন-এ যেতে বড়ই বেগ পেতে হয়েছিল। আমার ঠিক মনে আছে চালিন যাবার পথে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাটিই এখন বলব।

ইয়েংচি-সিচেং হতে বিদায় নিয়ে আমার হেন্‌চো-ফোঁ যাবার কথা ছিল। হেন্‌চো-ফোঁর দিকে ভাল পথও ছিল। আমি সে পথেই চলতে লাগলাম। পথ বড়ই সুন্দর। আমার সাইকেল বেশ চলছিল। আমি আনন্দে গান ধরেছিলাম—"ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।" গান আমার শেষ হল না। বঁধু এসে আমাকে শুধু ছুঁলই না, একদম ঘাড়ে ধরল! দুজন লোক এসে আমার সামনে দাঁড়াল। একজন আমাকে সাইকেল হতে নামতে বলল, অন্যজন আমার দিকে একটা আদিম যুগের বেনম্বরী পিস্তলের অগ্রভাগ মাথার দিকে লক্ষ্য করে দাঁড়াল। এতে আমি মোটেই ভয় পেলাম না। আমি সাইকেল হতে নেমে পথেরই পাশে বসে মনিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে পিস্তলধারী লোকটার দিকে নিক্ষেপ করলাম। সেও মনিব্যাগটা মাটি থেকে না তুলে পা দিয়েই আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুঝলাম এরা ডাকাত নয় তবে ডাকাতের মতই কিছু। যে লোকটি আমার সাইকেল ধরেছিল সে ইংগিতে আর কিছু আছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করল।


হু পে
হানকাউ
ইচাং
উচাং
চাংসা
চালিন
চেনচাও
সিউচে
কো য়া ন টা ন
ক্যান্টন
উ
প
পূ
দ

আমিও ইংগিতে জানালাম আমার কাছে আর কিছুই নেই। এতে লোকটা একেবারে তেড়েমেরে মস্তবড় একটা পাথর উঠিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। আমি তাতেও ভয় পেলাম না। সে নিকটে এসে আমার পকেট থেকে দেশলাই এবং সিগারেট বের করে নিল এবং আমাকে তাদের সংগে চলতে বলল। এমন সুন্দর পথ ছাড়তে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু কি আর করা যায়। এদের কথার অবাধ্য হলেও চলবে না। আমি তাদের সংগে চললাম। সমতলভূমি পরিত্যাগ করে টিলার গা বেয়ে বানানো পথে চলতে লাগলাম। সিঁড়ি দেওয়া পথ। এমন পথে সাইকেল টেনে নেওয়া বড়ই কষ্টকর। যে লোকটার হাতে কিছুই ছিল না তাকে সাহায্য করতে বললাম। সে সাহায্য করতে রাজি হল না। আমাকে ধীরে পথ চলতে হল। কতক্ষণ যাবার পর একজন লোক একটা নালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। সে লোকটি আমার এই দুরবস্থা দেখে হাসতে লাগল। লোকটাকে দেখেই মনে হল সে শিক্ষিত এবং ধনী। আমি যখন তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম সে যেন আমাকে কি বলল শুনতে পেলাম। বোধ হয় মেন্‌ডেরিন ভাষাতেই কিছু বলছিল। আমি তার কথায় কোন সাড়া না দিয়ে এগিয়ে চললাম। সাইকেলটা সিঁড়ির পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম বলে এত পরিশ্রম হয়েছিল যে মাথা হতে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম নাক বেয়ে পায়ের ওপর পড়ছিল। একেই বলে মাথার ঘাম পায়ে পড়া!

ধনী লোকটার হাসি, মাথার ঘাম পায়ে পড়া, সংগের পাহারা—এই তিনটি উপসর্গ মিলে আমাকে উত্তপ্ত করে তুলল। মাঝে মাঝে যেসব মাছি শূকরের রক্ত চুষে খায় সেই মারাত্মক মাছি এসে আমার গালে বসে এমন করে চুমু খাচ্ছিল যে চুমু খাওয়ার দংশন সহ্য করতে পারছিলাম না। যে দুটো লোক আমার সামনে এবং পেছনে ছিল

তাদের বড়ই অন্যমনস্ক দেখতে পেয়ে পালাবার চেষ্টা করা সমীচীন হবে কি না ভেবে পেছনের লোকটার দিকে চেয়ে দেখি সে আমার পেছনে নেই, সামনের লোকটাই আছে মাত্র। আমি ঘাড় ফেরাতেই সামনের লোকটা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরল এবং কি বলল তা মোটেই বুঝলাম না। তার হাতে কিন্তু মান্ধাতার আমলের পিস্তলটা ছিল। আমি ভাবলাম, চীনারাও মানুষ, তাদের আবার পিস্তল! আমার কুমতলব এল, মার বেটাকে এক লাথি। চিন্তা করা মাত্রই কাজও করলাম। লোকটা লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়তে লাগল। কোথা থেকে কতগুলি সেপাই এসে আমাকে কাবু করে হাত বেঁধে ফেলল। সাইকেল তারাই কব্জা করল। আমি ভাবলাম এবার বালাই চুকে গেল। সাইকেলটা তারাই নিচ্ছে ভালই, আমি আর এটাকে টানতে পারছিলাম না। সাইকেল, সাইকেল, সাইকেল, শুধু সাইকেলে ভ্রমণ আর সহ্য হয় না। এবার যদি এরা আমাকে মেরে ফেলে তবে মুক্ত হওয়া যাবে। কাঁহাতক আর এই দুঃখময় জীবন বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ান যায়। বাস্তবিক, জীবনের প্রতি আমার একটা বীতশ্রদ্ধার ভাব এল। জন্মেছি ভারতবর্ষে, এসেছি চীন দেশে। বৈরাগীদের মত বেড়াব আর খাব, এই ছিল ইচ্ছা। কোথা থেকে যত রাজ্যের বিপদ আপদ এসে পড়ল ঘাড়ে। আর দরকার নেই এ জীবনের। আমি বসে পড়লাম পথে। কয়েকটি সেপাই আমাকে একটু অত্যাচার করতেও চেয়েছিল কিন্তু যেন কার ইংগিতে তারা তা থেকে ক্ষান্ত হল। আমাকে তারা জোর করেই হাঁটাতে লাগল। কতক্ষণ যাবার পরই সিঁড়ি দেওয়া পথের শেষ হল। কয়েকজন লোক সাইকেল নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সিঁড়ি দেওয়া পথের পরই বৃক্ষ-রাজিতে পরিপূর্ণ সমতলভূমি। গাছগুলির পাতায় পাতায় বরফ পড়ে

বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনেকগুলি গাছের গোড়াতেও বরফ জমে রয়েছিল। আমি গাছের গোড়া থেকে বরফ ওঠাতে চেষ্টা করতে লাগলাম। অতি অল্প বরফই হাতে নিতে সক্ষম হলাম। আমার কষ্টজনক অবস্থা দেখে একজন লোক হাতের বাঁধন খুলে দিল। বাঁধনে হাতে বেশ দাগ পড়েছিল। চিহ্নযুক্ত স্থানে একটু একটু করে বরফ বুলাতে লাগলাম আর আকাশের দিকে চেয়ে মেঘের খেলা দেখতে লাগলাম। এরা বোধহয় তখন আমাকে পাগল বলেই ঠিক করেছিল কারণ এরূপ কষ্টের পরও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা কারো সম্ভব হয় না। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে একজন জিজ্ঞাসা করল— "সি-মে-মি-আ" অর্থাৎ আপনার নাম কি? আমার নাম কি তা আমার মনে আসছিল না। আমি ভাবছিলাম তখন অন্য কথা। আমি ভাবছিলাম মরণের পরই যদি সব শেষ হয়ে যায় তবে কেন এত কষ্ট সহ্য করা। মরণের পর কিছু আছে মনে করি বলেই আমরা এত সহ্য করে জীবন ধারণ করি। সে অনেক কথা। এমন সময় নিজের নাম কেন, আমার দেশ কোথায় তাও হয়ত বলতে সক্ষম হতাম না। এ জীবনে এত তন্ময়ভাব আমার কখনও হয় নি। কতক্ষণ পর আমার হুঁস ফিরে এল। আমাকে সাইকেলে গিয়ে বসতে বলা হল এবং তারপর দুজন লোক আমার সংগে দিয়ে আমাকে পথে ছেড়ে দেওয়া হল। এ দুজন লোক বিদেশী ভাষায় বিশেষ পটু। তাদের সংগে কথা বলে মনে শান্তি ফিরে এল। তাদের আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কেন ভিন্ন পথে নিয়ে আসা হল। তারা আমাকে বলল আমি যে পথে চলেছিলাম সে পথ হেন্‌চো-ফোঁর। 'মরণ বিজয়ী চীন'-এ ভুলক্রমে হেন্‌চো-কে হেন্‌চো-ফোঁ লেখা হয়েছে। এখানেও সে ভুল শুদ্ধ করা হল না। যখনই কোন গ্রামের পেছনে ফোঁ শব্দ যোগ করা হয়

তখনই বুঝতে হবে গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে হেন্‌চো আর গ্রাম নয় শহর হয়েছে, সেজন্য হেন্‌চো-ফোঁই রয়ে গেল। হেন্‌চো-ফোঁ হতে অনেক দূরে চালিন অবস্থিত। চালিন সুন্দর। চালিনের লোক শিক্ষিত। সুন্দর শহর এবং নবশিক্ষিত লোককে না দেখে গেলে নাকি আমার ভ্রমণই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার ভ্রমণ যাতে বিফল না হয় তার জন্যই আমাকে এতটুকু পথ হাঁটবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কথাপ্রসংগে বলেছিলাম যদি আমাকে বলা হতো যে এসব নতুন স্থান আমাকে দেখে যেতে হবে তা হলে আমি নিশ্চয়ই দেখে যেতাম। একজন তার দাঁতগুলি বের করে হাসতে হাসতে বলল—আপনার মানসিক অবস্থা আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি। আপনার নিজের কোন মতামত নেই। আপনি সোজা পথে চলতে চান সেজন্যই আপনি হেন্‌চো-ফোঁর দিকে রওনা হয়েছিলেন, অন্য লোক হলে চালিন-এর দিকে নিশ্চয়ই রওনা হতো। আপনি চালিন যাবেন না বলেই আপনাকে ধরে আনা হয়েছে।

বেলা বারটার সময় আমরা একটি ছোট গ্রামে বিশ্রাম করলাম। গ্রামে লোকজন বড়ই কম। গ্রাম পরিষ্কার। কোনরূপ দুর্গন্ধ দূর হতেও আসছিল না। গ্রামে নীরবতা বিরাজ করছিল। ছেলে মেয়েরা আমার দিকে কমই চেয়ে দেখছিল। গ্রামের লোক সকলেই কাজে ব্যস্ত ছিল। গ্রামের হোটেলে আমাদের জন্য পাক হয়েছিল শাক ভাজা, ভাত এবং মূলার ডাঁটার ঝোল। পেট ভরে খেয়ে আমি একখানা লেপ চেয়ে নিয়ে মাচার ওপর শুয়ে পড়লাম।

অন্যান্য গ্রামের মাচা হতে এই গ্রামের হোটেলের মাচা অন্যরকমের। মাচা অনেক উঁচু। মাচার নীচটা পরিষ্কার। খিড়কী দরজা দেয়াল কেটে নতুন করে বসান হয়েছে দেখলেই বুঝা যায়।

এসব ঘরে পূর্বে খিড়কী দরজা ছিল না। খিড়কী দরজা খুলে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। আমার পাশে আমার সাথীদের একজন শুলেন, অপর লোকটি কতকগুলি কাগজে তুলি দিয়ে কি লিখতে লাগলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি এসব কি লিখছেন। ভদ্রলোক বললেন—আমাকে কি করে এখান পর্যন্ত আনা হয়েছে তাই লিখছেন এবং আজই এই গ্রামের লোক দেয়াল-সংবাদপত্রে এই সংবাদ গল্পের আকারে পাঠ করবে। সাধারণত হোটেলগুলির দেয়ালেই দেয়াল-সংবাদপত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই হোটেলেও একখানা দেয়াল-সংবাদপত্র ছিল। আমি হোটেলে ঢুকবার পূর্বে তাই ভাল করে দেখলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে সক্ষম হলাম না।

বিকাল বেলা আবার আমরা চলতে লাগলাম। আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার ছিল। সাইকেল চালাতে বেশ ভালই লাগছিল। সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আমরা একটা প্রকাণ্ড মাঠে আসলাম। সেখানে কতকগুলি মৃতদেহ পড়ে রয়েছিল। মড়াগুলির কবর দেবার কোনও বন্দোবস্ত হয় নি। এসব মরা মানুষ এখানে কি করে এল একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। এসব লোককে নাকি গুলি করে মারা হয়েছিল সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বলে। এর বেশি সাথীরা কিছুই বললেন না। মরা মানুষগুলির শরীরে যে পোষাক ছিল তা বেশ মূল্যবান বলেই মনে হয়েছিল।

রাত্রে আমরা একটা প্রকাণ্ড গ্রামে এলাম। গ্রামে আলোর বড়ই অভাব ছিল। এখানেও এসে আমরা একটি হোটেলে উঠলাম। হোটেলের পাশে একটা পতাকা ঝুলছিল। সে পতাকা কিরূপ রাত্রে তা দেখিনি, পরের দিন সকালবেলা দেখেছিলাম। সেই পতাকা ছিল লাল ঝাণ্ডা। এখান হতেই চাল্গিন সোভিয়েটের শুরু হয়েছে। হট্টগোল

নেই, সেপাই নেই, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে অথচ ভিন্ন লোক ভিন্ন ধরনের শাসন কাজ চালাচ্ছে। নতুন শাসনপদ্ধতিটা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। বেকার, ভিখিরী, বারবণিতা, দুর্গন্ধ, শিশুমজুর, জিনিস নিয়ে দর কষাকষি, বেশি কথা বলা—এসব কিছুই ছিল না। সবাই লেখাপড়ায় এবং কাজে ব্যস্ত। বেশ একটা আপনা আপনি ভাব মনে হচ্ছিল।

রাত্রে আমরা একটি নাইট স্কুলে গেলাম। সেখানে অন্ততপক্ষে হাজার লোক লেকচার শুনছিল। আমরাও পেছনে বসে লেকচারই শুনছিলাম। যে ভদ্রলোক লেকচার দিচ্ছিলেন তার লেকচার যখন শেষ হল তখন আমাকে ডেকে নিয়ে দাঁড় করান হল। আমি সবাইকে আমাদের দেশী প্রথামতে নমস্কার করে কিছু বললাম। এত লোককে এত অল্প স্থানে নীরবে শৃংখলার সহিত বসতে দেখে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে এরা প্রকৃতই কাজের লোক, এরা বাজে হৈ চৈ করে না। আমার কথা চীনা ভাষায় অনুবাদ করে বলা হলে সবাই হাত তুলে একটা ইংগিত করলে যাতে মনে হল হাজার হাত একই সংগে যেন আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাদের সব পদ্ধতির সংগে আমার পরিচয় ছিল না, সেখান থেকে অনেক কিছুই শিখে নিতে সক্ষম হলাম, অনেক কিছু নূতন করে জানলাম। চাঙ্গিন-এ যে বিরাট শক্তি দানা বেঁধে উঠছিল তা স্বচক্ষে দেখলাম।

দুই ঝাণ্ডা

দেশ বিদেশের পতাকাগুলি সকল সময় আমাদের চোখে পড়ে না। যদিও বা বৈদেশিক পতাকা আমরা দেখি তবুও তাতে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। চীন দেশের পতাকা কত রকমের তার সন্ধান কজন রাখে? সিংগাপুরে থাকার সময় চীনের পতাকা দেখেছিলাম এবং তাকে পূর্ণচন্দ্রের সংগেই তুলনা করতাম। চীন দেশে যাবার পর মত বদলাতে হয়েছিল। সেখানে লোকে সাদা সূর্য বলেই চীনের পতাকার নির্দেশ করে থাকে। সোভিয়েট দেশগুলিতে কিরূপ পতাকা ব্যবহার করা হয় তা লোকমুখে আমরা যা শুনি তারই একটা ছবি এঁকে থাকি। চালিন সোভিয়েটের পতাকাখানাকে রাত্রের বেলা ভাল করে দেখতে পারিনি সত্য কথা, কিন্তু কাস্তে এবং হাতুড়ি যে পতাকার মধ্যস্থলে ছিল তা সকল সময় সকলেরই চোখে পড়ে থাকে। পরের দিন সকালে উঠে লাল পতাকাখানা ভাল করে দেখে বুঝলাম এতে পুরাতন চীনের পতাকাকে একেবারে লোপ করা হয়নি। লাল কাপড়ের ওপর সাদা সূতা দিয়ে সাদা সূর্যের বদলে একটি গোলক করা হয়েছে এবং তারই ওপর মস্ত বড় করে কাস্তে এবং হাতুড়ি এঁকে দেওয়া হয়েছে। খালি চোখে সূতার বৃত্তটা ধরাই পড়ে না। সেদিন সকালবেলা নানা দেশের পতাকা সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করে পথে চলছিলাম আর মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে আসছিল আমার অজ্ঞাতে। চীনারা কেন, জগতের প্রায় জাতই উন্নত অবস্থায় লাফিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের এগোবার দরকার নেই; আমরা যে কী তারই ঠিক হল না!

এরূপ চিন্তাধারা আপনি আসে। এতে কেউ বাধা দিতে পারে না কারণ নিজের অবস্থার সংগে অন্যের অবস্থার তুলনা করতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়।

দুপুর বেলায় আমরা একখানা গ্রামে আসি। সেই গ্রামে একটি মিলিটারী স্কুল ছিল। স্কুলের ঘর-বাড়ি দূর হতেই দেখা যাচ্ছিল। আমরা সরাসরি স্কুলে না গিয়ে প্রথমত হোটেলে গেলাম এবং বিকাল বেলা নিশ্চয়ই মিলিটারী স্কুলে যাব তা ঠিক করে রাখলাম। সাথীদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম মিলিটারী স্কুলে ছাত্রদের মাত্র এক মাস শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এক মাসের মধ্যেই প্রত্যেক ছাত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে কি করে লড়াই করতে হবে তা থেকে শুরু করে কি করে গঠন কাজ করতে হবে তারও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মনে মনে ভাবলাম একেই বলে আসল শিক্ষা। দরকার পড়লে ছাত্রদের এক মাসে শিক্ষা সমাপ্ত হয়, আর যখন দরকার হয় না তখন সারাজীবন বিদ্যালয়ে কাটালেও শিক্ষার শেষ হয় না।

খাওয়াটা হল বেশ ভালই। খাওয়ার পর বিশ্রাম করছিলাম এবং নানা কথা চিন্তা করছিলাম। সেই নানা কথা অন্যের সম্বন্ধে নয়, নিজেরই সম্বন্ধে। কিন্তু একজন সাথী আমার চিন্তা স্রোতের টানে ধরা পড়ে গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোণে বসে কি ভাবছেন? আমি আর কি বলব, আসল কথা কোন মতেই বলতে পারি না, কারণ তা ছিল আমার ভ্রমণ সম্পর্কেই। তাই একটা বাজে কথার অবতারণা করতে বাধ্য হলাম, বললাম, দুটো ঝাণ্ডাকে বোধ হয় একটা করা হয়েছে তাই নয় কি? সাথী বললেন এ সম্বন্ধে মিলিটারী স্কুলে গিয়ে কথা বলা হবে।

বেলা আড়াইটার সময় বেশ এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তারপর

সুতার নালের মত বরফ পড়তে শুরু হল। ভাল করেই বুঝলাম আজ এখান থেকে নড়া মুশকিল হবে। তাই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে কিছু খেতে ইচ্ছা হল কিন্তু দোকানগুলিতে কেনার মত কিছুই ছিল না। ভাবলাম এই যদি সোভিয়েট চীন হয় তবে ত বড়ই মুশকিলের কথা। একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কোন মিঠাই পাওয়া যায় না? সাথী বললেন—মিঠাই পাওয়া যায় তবে এখন পাবেন না, আরও এক ঘণ্টা পরে একখানা দোকানে মিঠাই বিক্রী করবে। আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার চাহিদা লিখে দিয়ে আসি। কথাটা বলার সময় এক সাথী অন্য সাথীকে চোখের ইশারা করলেন। বুঝলাম আমার কথা বলে মিঠাই আনা হবে এবং তারাও তাতে ভাগ বসাবে এই ছিল তাদের ইংগিতের মতলব।

সাথী ফিরে আসার পর আমরা মিলিটারী স্কুলে গেলাম। কয়েক-জন মাত্র ছাত্র তখন উপস্থিত ছিল। তারা আপন আপন কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাদের যাবার পর কেউ আমাদের দিকে চেয়েও দেখল না। এতে আমার বড়ই রাগ হল। তখনকার দিনে আমার একটা বদ অভ্যাস ছিল—যদি কেউ আমার দিকে না তাকাত, আমি ভাবতাম সে লোকটা আমাকে অবজ্ঞা করছে। এরা কিন্তু আমাকে অবহেলা করেনি। তারা একাগ্রচিত্তে কাজই করছিল। সাথীরা ওদের কাজে বাধা দিল এবং কথা বলতে শুরু করল। এদের মধ্যে বেশ কথাবার্তা হল। তারপর একজন সাথী আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমাদের দুটো ঝাণ্ডা কেন একত্রিত হল তার কারণ বলছি।

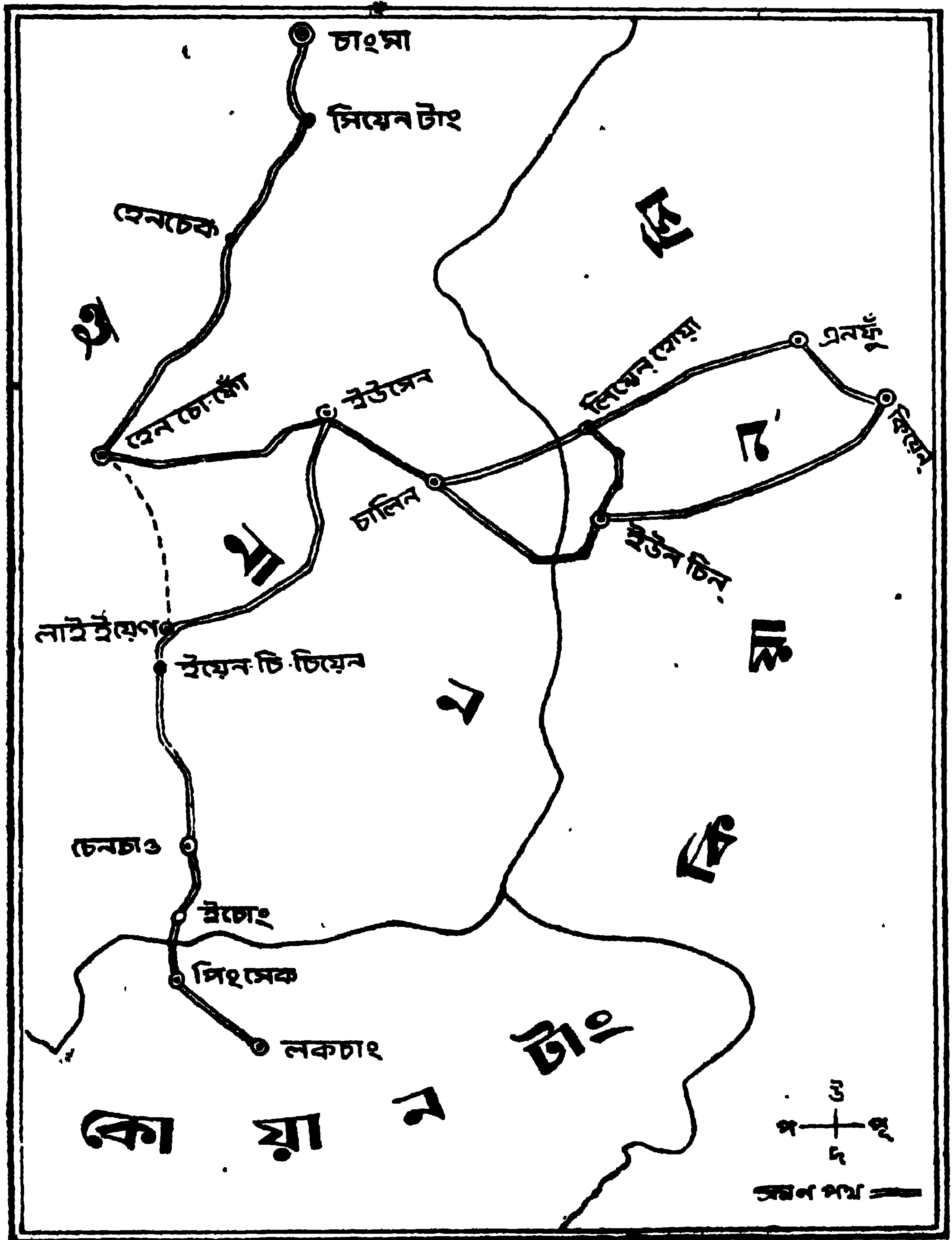
ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন যে পতাকা আমাদের দেশের জাতীয় পতাকারূপে গ্রহণ করেছেন তা আমরা অবজ্ঞা করি না, কিন্তু তা বলে লাল ঝাণ্ডাকেও আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। ১৯১১ সালে আমাদের

দেশে জাতীয়.ভাব এসেছিল এবং সংগে সংগেই ঝাণ্ডাও নতুন করে গড়ে উঠেছিল। চীনের সনাতনীরা হলেন সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী। আমরা জাতীয়তাবাদীদের একটা বিশেষণ উড়িয়ে দিয়েছি বটে, তবু আমরা চীনাই আছি, রুশ হয়ে যাইনি অথবা জার্মান ভাষা আমাদের মাতৃভাষায় পরিণত হয়নি। আমরা চীনা ছিলাম, এখনও চীনাই আছি, ভবিষ্যতেও চীনাই থাকব। শুধু বৈদেশিক প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণ করেছি। সেজন্য যতটুকু পরিবর্তন করার দরকার ততটুকুই আমরা পরিবর্তন করেছি। কথাটা অযৌক্তিক নয়, আমাকে তাদের কথা মেনে নিতে হয়েছিল। হারবিনে গিয়ে যখন সোভিয়েট রুশের পতাকা দেখেছিলাম তাতেও পুরাতন রুশ পতাকার ওপরই লাল ঝাণ্ডা গড়ে উঠেছে দেখতে পেয়েছিলাম। চীনাদের পতাকা পরিবর্তনের একটা হদিস পেয়ে আনন্দই হয়েছিল। মনে মনে তাদের প্রশংসাই করেছিলাম। ন্যাশানালিজমকে ভিত্তি করেই সোসিয়ালিজম গড়ে ওঠে।

চালিন্ সোভিয়েট

বিকালবেলাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমাকে কাঁপিয়ে তুলছিল। আমি এই গ্রাম হতে আজ যাব না বলে ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সাথীরা দু একবার আমাকে রওনা হতে বলেছিলেন কিন্তু আমি তাতে কান দেইনি। রাত্রে হোটেলে না খেয়ে এক কৃষকের বাড়িতে খেতে গেলাম। কৃষকের সেই পুরাতন বাড়ি, দেখলেই মনে হয় বাড়িটার উন্নতি মোটেই হয়নি। তবে একটা উন্নতি দেখে বড়ই আনন্দ হল। কৃষকের সাথে যে সকল মজুর থাকে তাদের পাচক আছে, স্নানের ব্যবস্থা আছে, শোবার ভাল বিছানা আছে আর খাবার জন্য উত্তম খাদ্যেরও ব্যবস্থা মজুররাই করে, এতে কৃষকের কোন হাত নেই। পূর্বে কৃষক ছিলেন তাউকী, অর্থাৎ ধনী। এখন কৃষক মহাশয় আর ধনী নন, তিনিও একজন মজুরই। এখন শীতের সময়। মজুরা প্রায় চলে গেছে। যারা আছে তারা কৃষকের শস্য পাহারা দিচ্ছে। তারা দেখে কৃষক গোপনে কোন শস্য বিক্রি করে কি না, জমিতে কাজ করবার জন্য হাল চাষের যন্ত্রগুলি যে মিস্ত্রি পরিষ্কার করছে তার উপযুক্ত মজুরী দেয় কি না। যে সব কাজ কৃষকের নিজের, সে সব কাজ সে ঠিক ঠিক ভাবে করছে কি না। কাজের সময় এরা ছিল মজুর, এখন এরা সেপাই এবং মালিক।

আমাদের যাবার পরই খাবারের ব্যবস্থা হল। নানারূপ খাদ্যের সমাবেশ হল। অন্ততপক্ষে ছয় রকমের চাটনি আমাদের জন্য চাষী মহাশয়ের স্ত্রী নিজ হাতে পাক করেছিলেন। হরিতকীর যে চাটনী হয়


চাংসা
সিয়েন টাং
হেনচেক
হেন চো-কোঁ
হুঁউসেন
চালিন
এনফুঁ
ইউন চিন
লাই ইয়েণ
ইয়েন-টি-চিয়েন
চেনচাও
সিংসেক
লকচাং
উ
প
পূ
দ

তা আমার জানা ছিল না। হুনান প্রদেশের লোক শাকসব্জীই বেশির ভাগ খেতে ভালবাসে বলে মনে হল। নানারূপ সব্জি সিদ্ধ করে চীনা বাসনে সজ্জিত করে রাখা ছিল। আমরা বেশ করে খেয়ে নিয়ে চাষার বাড়িতেই থাকতে মনস্থ করলাম। আমার হোটেলে যেতে ইচ্ছা হল না। হোটেলগুলির বিছানাতে উকুন ছিল, এখানে তা মোটেই নেই। রাতটা চাষার বাড়িতে কাটিয়ে আমরা পরের দিন চালিন-এ রওনা হলাম। দুপুরবেলা এক স্থানে বসে বিশ্রাম করতে এবং খেতে হয়েছিল। এদিকে যেন একটা সাজ সাজ ভাব অনুভব করলাম। কার বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহ? জাপানীদের? দেখে তাই মনে হল। আজ-কাল ভারতে যেমন জাপানীদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ছবি দেখতে পাওয়া যায়, এদিকেও সেই ছবিই দেখতে পেলাম। ছবিগুলি দেখলেই জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আপনি মনে জেগে উঠে। চীনের একখানা মানচিত্র এঁকে তার ভেতরে একটা মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে, মানুষটির একখানা হাত কাটা। কাছে কয়েকজন জাপানী দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে। তাদের একজনের কাছে অংকিত মানুষটির একখানা হাত রয়েছে। হাত হতে রক্ত টপ টপ করে পড়ছে আর একজন মোটা জাপানী সেই রক্ত পান করছে। সেই ছিন্ন হাতখানাতে লেখা ছিল মানচুরিয়া। আমাদের বর্মাদেশ ভারত হতে পৃথক হবার পর জাপানীরা এসে মানচুরিয়ার কতক দখল করে বসেছে। কি করে বর্মাদেশ ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। বর্মাদেশ যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন কতকগুলি বর্মণ আমাকে বার বার বলতে চেয়েছিল বর্মাদেশ ভারত হতে বিচ্ছিন্ন করে বৃটিশ ভালই করেছে। আমার তখন মনে হয়েছিল চালিন-এর পথের কথা। আমি এসব লোককে মানচুকোর

বিশ্বাসঘাতক সেপাইদের সংগে তুলনা করেছিলাম। কারণ মানচুরিয়ার কতকগুলি চীনা বলত জাপানীরা মানচুরিয়াকে চীন হতে পৃথক করে ভালই করেছে। ওদের আমার ধারণা সম্বন্ধে কিছুই বলিনি কারণ রাজশক্তি তাদের সহায় ছিল। যদি কিছু বলতাম তবে হয়ত আমার ভ্রমণ তখনই খতম হয়ে যেত। আমরা যদি বৃটিশকে তখনই বুঝিয়ে দিতাম যে তাদের কাজটা অন্যায় হয়েছে, তবে হয়ত জাপানীরা ব্রহ্মদেশের রক্ত আজ শোষণ করতে পারত না। বর্মাদেশ ভারত মহাদেশ হতে পৃথক করা মোটেই উচিত হয়নি, তার ফল আমরা দেখতেই পাচ্ছি। চালিন-এর পথে কার্টুন ছাড়া আরও অনেক রকমের ছবি দেখেছি, সেসব ছবির কথা এখন না বলাই ভাল। পর্যটক অনেক দেখতে পায় তবে সকল কথা সকল সময় ব্যক্ত করতে সক্ষম হয় না। চীনদেশের ১৯৩১ সালে যে অবস্থা ছিল ভারতের ১৯৪৩ সালের সংগে সেই অবস্থার বেশ মিল রয়েছে, শুধু একটিমাত্র পার্থক্য আছে সেটি হল ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট। চীনাদের জাতীয় সরকার বলে কিছুটা ছিল।

বিকাল পাঁচটার সময় আমরা চালিন-এ আসি। সাথীদের আমি বললাম—এখন আমি গ্রামে যাব না, একটু বিশ্রাম করার পর যাব। আপনারা গ্রামে গিয়ে আমার থাকবার বন্দোবস্ত করুন। আমার কথার ওপর আস্থা স্থাপন করে সাথী দুজন চলে গেলেন। আমি নিকটস্থ স্রোতহীন একটি ছোট নদীর তীরে বসে পড়লাম। কতক্ষণ নদীর জলের দিকে চেয়ে থাকবার পর আমার দৃষ্টি গেল একটি বালিকার প্রতি। বালিকা একাকী মাঠে বসে কাঁচা ঘাস শাকের মত উপড়াচ্ছিল। বালিকাটির বয়স বার বৎসরের বেশি হবে না। আমাকে সে দেখতে পেল। সনাতন চীন রাজ্যের এই বয়সের

কোন চীনা বালিকা আমাকে দেখে এরূপ নির্ভীক ভাবে কাজ করতে পারত না, আমাকে ভূত ভেবে পালিয়ে যেত নয়ত ভয়ে ভীত হয়ে অজ্ঞান হতো। কিন্তু এই বালিকা সেরূপ নয়। মনে ভাবলাম এদের সমূহ পরিবর্তন হয়েছে। আমি বেশিক্ষণ মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলাম না। হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। আমার মগজে গাঁজাখোরদের মত একটার পর একটা চিন্তা আসছিল আর নিমিষে লয় পেয়ে যাচ্ছিল। সেই চিন্তাধারার মধ্যে ছিল ব্রহ্মদেশ সমেত আমার জন্মভূমি ভারতমাতার ছবি আর তারই সংগে ভেসে উঠছিল চীনের ঘটনাবলী।

এই চিন্তাধারার মাঝেই কখন যে নিদ্রা এসে আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল তা আর বলতে পারি না। হঠাৎ যেন মনে হল নিকটে বসেই কেউ কথা বলছে। উঠে বসে দেখলাম একজন বৃদ্ধ লোক আমারই কাছে বসে আছেন। বৃদ্ধের দাড়ি কয়টি বড়ই সুন্দর। হাতে তাঁর চীনা হুঁকো। তিনি আমাকে দেখেও বার বার হুঁকোতে তামাক দিচ্ছিলেন এবং টানছিলেন। তাঁরই নিকটে ছিলেন আমার পরিচিত লোক দুজন। তাঁদের দেখেই আমি আর বসে থাকলাম না, উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধকে একটা নমস্কারও করলাম। বৃদ্ধ শান্ত এবং নির্ভীক। বৃদ্ধও উঠে দাঁড়ালেন। আমার মনেই ছিল না আমি সোভিয়েট চীনে এসেছি। সোভিয়েট চীনের লোক পূর্বের প্রথামত আর নমস্কার করে না। সকলেই করমর্দন করে। পুরুষ মেয়ে সবাই করমর্দন করে। সাথীরা বৃদ্ধের সংগে করমর্দন করতে বললেন, আমিও তাই করলাম। বৃদ্ধ এতে খুশিই হলেন।

তখন সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। শীতের প্রাবল্য বেশ বেড়ে গেছে। আমি কাঁপছিলাম। আমরা গ্রামে প্রবেশ করে

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। গ্রামে ফুটপাথ এই প্রথম দেখলাম। চীন জাপান ভারত কোথাও গ্রামে ফুটপাথ নেই কিন্তু সোভিয়েট চালিন-এ ফুটপাথ আছে। আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসি বলেই দৃশ্যটা আমার ভাল লেগেছিল।

গ্রামের লোকসংখ্যা প্রচুর কিন্তু কোথাও চেঁচামেচি নেই। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। এ বিষয়ে চালিন-এর সংগে যে-কোন মার্কিন গ্রামের তুলনা করা যেতে পারে। ইউরোপের গ্রামেও ছেলেমেয়েদের গুণ্ডামী দেখতে পাওয়া যায়। চালিন এ হিসাবে ইউরোপকে ডিংগিয়ে গেছে। আমরা পথ চলে একটি বড় হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হোটেলের ভেতরে নানারূপ বাতি জলছিল কিন্তু বার থেকে মনে হচ্ছিল না ঘরের মধ্যে এত রোশনাই রয়েছে। আমরা দুটো দরজা পার হয়ে হোটেলের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। সেখানে নামজাদা কয়েকজন লোকও ছিলেন কিন্তু আমি ওদের নাম শুনে লাফিয়ে উঠলাম না, কারণ তখনকার দিনে অন্তত আমার কাছে এসব লোকের কোনরূপ বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমি আরাম করে একটি চেয়ারে বসে সবুজ চা পান করতে লাগলাম এবং চিনির অভাব অনুভব করতে লাগলাম। একজন লোক আমার কাছে এসে গ্রামখানা কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম গ্রামে এই সর্বপ্রথম ফুটপাথ দেখে আমার ভারি আনন্দ হয়েছে। পথে যে সকল সোভিয়েট গ্রাম দেখেছি কোথাও অভাব দেখিনি, তবে মিঠাই-এর অভাব অনুভব করেছি। দুদিন পূর্বে সামান্য মিঠাই খেতে পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন—আমরা পৃথিবীর সকল রকম মিঠাই এখানে তৈরী করব কিন্তু এখনও সেই সময় আসেনি। এখন আমাদের আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসরণ করতে হবে।

চীনদেশে ছোট বড় নানারূপ হোটেল আছে। এই হোটেলটির

দুটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথম বিশেষত্ব, এই হোটেলে খাবারের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। নিকটস্থ এক বাড়িতে একটা খাবারের দোকান ছিল তাতেই সকলকে গিয়ে খেয়ে আসতে হত। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল, এখানে গণিকাদের গমনাগমন ছিল না। জাপান এবং কোরিয়া ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই হোটেলগুলিতে নানারূপ ব্যভিচার হয়ে থাকে। মনে করবেন না এখানে জাপানী প্রথা ধার করে আনা হয়েছে, স্বভাবতই গণিকা চালিন গ্রামে নেই বলেই ব্যভিচারও নেই।

হোটেলের একটি টেবিলে পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদপত্র সন্নিবেশিত ছিল। আমি বৈদেশিক ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির মাঝ থেকে কোলকাতার 'এডভান্স' কাগজখানা বের করে মন দিয়ে পড়তে লাগলাম। সংবাদপত্র পাঠ হয়ে গেলে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি প্রকারে এই ভারতীয় সংবাদপত্রখানা স্থান পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছে? যাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বললেন সাংহাই হতে এই ভারতীয় সংবাদপত্রখানা লোক মারফত কিনে আনা হয়। সেই ভদ্রলোকই আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নগুলির প্রথম প্রশ্ন হল—এই গ্রাম সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হয়েছে। আমি বললাম—পূর্ব এশিয়ার যতগুলি দেশ দেখেছি কোথাও গ্রামে ফুটপাথ দেখিনি। চালিন গ্রামেই সর্বপ্রথম ফুটপাথ দেখতে পেলাম। এখানকার লোক বেশ সভ্য, অনর্থক কোন কথা বলে না বা নবাগতকে দেখবার জন্য একবারে উতলা হয়ে যায় না। ভদ্রলোকের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ভারতের লোক চীন সম্বন্ধে কি মত পোষণ করে। এ বিষয়টার জবাব দিতে আমার একটু চিন্তা করতে হয়েছিল কারণ তখনকার দিনে ভারতের লোক চীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানত না। যে কয়জন পর্যটক চীনদেশ ভ্রমণ করে বই লিখেছিলেন তাঁরা শুধু

চীনের সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলি দেখেই যা মনে এসেছে তাই লিখেছেন, চীনের লোকের সংগে মিশেনও নি এবং চীনের গ্রামেও যান নি। আমার একটা ধারণা ছিল চালিন-এর লোক আমার কাছে কোনরূপ শঠতা অথবা মিথ্যাকথা চায় না, তাই প্রশ্নকারীকে সত্য কথাই বললাম। ভদ্রলোকও আমার কথায় রাগ করেন নি, শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, তাই নাকি? আমি বললাম, যা বলেছি তাই। ইংরেজী দৈনিকখানা দেখুন এতে চীনের সংবাদ মোটেই নেই। ভদ্রলোক সংবাদপত্রের দিকে মোটেই তাকালেন না। আমার কথা শুনে তাঁর মুখের রং বদলে গিয়েছিল তা আমার মত লোকের চোখেও ধরা পড়েছিল। নিজের দেশের কুসংবাদ কে শুনতে চায়? কতক্ষণ পর আবার ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—চালিন সোভিয়েট যাতে করে বাঁচে তার জন্য আপনি কি করতে পারেন? আমি বললাম—যদি দরকার মনে করেন তবে আমাকে খাটাতে পারেন, এর বেশি আমার এখন কিছুই করবার নেই। এখান হতে বের হবার পর যদি আপনাদের পক্ষ হয়ে দেশ-বিদেশে লেকচার দিতে থাকি তবে কেউ আমার কথা শুনবে না। অনেকে হয়ত আমার যাতে পর্যটন আর না হয় তারই চেষ্টা করবে। সাইগনে ফরাসী পর্যটক মঁসিয়ে পারেয়ারীর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন তিনি একদিন ভুলক্রমে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রশংসা করেন। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে চিরতরে দেশ-পর্যটন বন্ধ করতে হয়েছে। সোভিয়েটের প্রশংসা করাটা সাম্রাজ্যবাদীদের সহ্য করা দুষ্কের কথা, যখন যার মুখ হতে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েটের প্রশংসা শুনে তাকেই পাগলা কুকুরের মত আক্রমণ করে দংশন করবার চেষ্টা করে। আমাকে কি আপনারা পাগলা কুকুরের হাতে ফেলে দিতে

চান? হয়ত আপনাদের সামনে সকল কথাতেই আমি হাঁ করে যাব কিন্তু কাজে কিছুই করব না। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আর কিছুই বললেন না।

সকালবেলা ঘর থেকে বের হবার পূর্বেই আমার সাথী দুজন আসলেন এবং আমাকে গ্রাম দেখাতে নিয়ে গেলেন। গ্রামটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চীনাদের ঘরের পেছনটা সাধারণত অপরিষ্কার থাকে, এই গ্রামে তা মোটেই নেই। শূকর, হাঁস, মুরগী অন্যান্য গ্রামে থাকতে পারে, এ গ্রামে তার ব্যবস্থা নেই। গৃহপালিত জীবকে গ্রামের বাইরে রাখতে হয়। গৃহপালিত জীবের মালিক গ্রামের সকলেই। হাঁস, মুরগী, শূকর যত আছে তা একজনের দ্বারা পালিত হয় না। যারা এই কাজে দক্ষ তারাই এসব কাজ করে। এসব লোক গ্রামের লোকের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রতিপালিত হয়।

এশিয়ার পূর্বদেশগুলিতে আবৃত ড্রেনের বড়ই অভাব। চীনদেশ সে দোষ হতে বাদ পড়েনি। ভারতের শুধু বেনারসেই আবৃত ড্রেনের বন্দোবস্ত পূর্বকাল হতেই ছিল, আর কোথাও আবৃত ড্রেন ছিল কিনা তা জানি না। পূর্বদেশগুলির ইতিহাসও সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। চালিন-এ ঢাকা ড্রেনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। পূর্ব এশিয়ার এই গ্রামেই সর্বপ্রথম ঢাকা ড্রেনের বন্দোবস্ত দেখে সমাজ গড়নের প্রথম স্তরের কথা মনে হল এবং আর্য সভ্যতার কাছে আপনি মাথা ঝুঁকে এল।

পথে চলার সময় আমি আবৃত ড্রেনগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছি দেখে সাথীরা এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বললেন। পথে চলার সময় কথা না বলাই অভ্যাস কিন্তু এ বিষয়ে নীরব না থেকে তাদের সংগে কথা বললাম। চীনদেশ হতে যেমন প্রথম মুদ্রাযন্ত্র এবং কম্পাস্ বেরিয়েছিল তেমনি আর্যরাও প্রথম ড্রেন প্রথার প্রবর্তন

করেছিল। ড্রেন প্রথাটা হওয়ার জন্য আর্যরা কতদূর উন্নতি করেছিল তা বলে লাভ নেই, তবে যারা বারুদ, প্রেস এবং কম্পাস আবিষ্কার করেছিল তাদের চেয়ে ঢের বেশী এগিয়ে গিয়েছিল এটা সুনিশ্চিত। ড্রেন প্রথা সামাজিক উন্নতির একটা বিশেষ লক্ষণ। আপনাদের এখানে যিনি সোভিয়েট স্থাপন করেছেন তিনি পণ্ডিত লোক তাতে আর কোন সংশয় নেই। আমার কথা শুনে সাথীরা খুশি হয়েছিলেন।

আমরা চললাম গ্রামের স্কুলের দিকে। স্কুলটি গ্রামের বাইরে অবস্থিত। স্কুলে নানা রকমের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। একদিকে যেমন ছুতোরের কাজ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অন্য দিকে তেমনি ভৈষজ্যশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে গিয়ে মনে হল এসব ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করতে আসেনি, যার যেখানে যা গলদ তাই অপসারণ করতে এসেছে। এতে শিক্ষকের বড়ই কষ্ট হয়। বিশেষ কোন ক্লাস নেই, বিভাগ আছে মাত্র। অংক আমি জানি না মোটেই, তবুও ঘুরতে ঘুরতে অংকের ক্লাসেই গিয়ে হাজির হলাম। অংকের শিক্ষক মহাশয় একটার পর আর একটা অংক কষে যাচ্ছেন আর ছাত্রেরা তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন করে হয়রান করছে। আমাদের দেশে শিক্ষকগণ ছাত্রদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যেমন একটা অংক কষতে দিয়ে একটু বিশ্রাম করেন, চীনা শিক্ষক সেরূপ কিছুই করেন না. তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান। ছাত্রেরা তখন বুঝে নেয় শিক্ষকের অবসাদ এসে গেছে। আমাদের দেশের ছাত্রেরা শিক্ষক বেরিয়ে গেলে হট্টগোল শুরু করে আর চীনা ছাত্রেরা একদম চুপ হয়ে আপন আপন গলদ কোথায় আছে খুঁজতে থাকে। পরীক্ষা পাস করা আর শিক্ষা করার এখানেই প্রভেদ।

গ্রামের লোক সংখ্যার অনুপাতে স্কুলের আয়তন আমার কাছে বড়

বলেই মনে হল। যেখানে মানুষ জানতে চায় সেখানে স্কুলের আয়তন বড়ই হয়। আমি স্কুলটি দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম এবং হংকং-এ যারা আমার বিত্তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল তাদের মনে মনে জাহান্নামে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিলাম। এই গ্রামের ছাত্রদের পোষাক অন্য ধরনের। তারা অসামরিক পোষাক পরে না। তাদের পোষাকও সেপাইদের মতই। সকল সময় এদের পল্টনী পোষাকে থাকতে হয়। চীনাদের অসামরিক পোষাক আমার কাছে মোটেই ভাল লাগত না বলে এখানকার ছাত্রদের পোষাক দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল।

গ্রাম ঘুরে যখন হোটেলে আসলাম তখন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম এত বড় গ্রামে এত কম হোটেল কেন? সাথী বললেন—এখানকার হোটেলওয়ালারা মুনাফা করতে পারে না। যত হোটেল দেখছেন সব হোটেলই গ্রামের লোক দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রামের লোকের নানা কাজ আছে। এই গ্রামে অনেক হোটেল ছিল। সে-সব হোটেল আর নেই। লোকের অভাবই তার একমাত্র কারণ। অজ্ঞতাবশত কত হোটেলে দ্বিগুণ তিনগুণ পয়সা দিয়েছি তার হিসাবও করতে পারব না অথচ এখানে হোটেলের লোক মুনাফা নিতে পারে না, তা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য মনে হল। পুঁজিবাদীরা যেভাবে হোটেল চালায় এখানের হোটেলগুলি তার চেয়ে সহস্রগুণ ভাল ভাবে পরিচালিত হয়। হোটেলের বয় বাবুর্চি না বলে এখানে হোটেল-কর্মী বললেই ভাল হয়। হোটেল-কর্মীরা জাপানী বয়দের মত সর্বদাই হাসিমুখ। পরিষ্কার কাপড় তারা পরে। দাঁতগুলি তাদের ধব্‌ধবে। নখগুলি সুন্দরভাবে কাটা। জুতা ব্রুস করা। গ্রামে বারবনিতা নেই বলেই হোটেলে বারবনিতা আসে না। প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই বিয়ে করেছে। সনাতন যুগের চীনে বিয়ে করাটা এক বিপজ্জনক কাজ। প্রথম বিপদ

হল বিয়ের খরচ। দ্বিতীয় বিপদ হল ছেলে-পিলে যখন আসতে থাকে তখন যদিও ভাতের ব্যবস্থা হয় ত কাপড়ের ব্যবস্থা হয় না। এরূপ কষ্টে কে যেতে চায়? এখানে সে চিন্তা করতে হয় না। আসুক না ছেলে মেয়ে যত খুশী, তাদের অভ্যর্থনার জন্য সুবন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। এদিকে বারবনিতারা গ্রাহক না পেয়ে দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই ত গেল হোটেলের কথা। পরের দিন নিকটস্থ একটা গ্রামে গেলাম। গ্রামে লোক ছিল না। গ্রামের বাসিন্দাদের অন্য গ্রামে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন এ গ্রামে অস্ত্র তৈরী হয়। অসংখ্য লোক কাজ করছিল। প্রত্যেকটি লোক চটপট করে দক্ষতার সহিত মনদিয়ে অস্ত্র তৈরীতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল। সকলের মুখেই একটা চিন্তা, এই বুঝি কারখানা আক্রান্ত হল। আক্রান্ত হোক আর নাই হোক, আমার তাতে কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা দৈনিক কত মাইনে পায়। কারখানার ম্যানেজার বললেন এরা কখনও পেট ভরে খেতে পেত না, কাপড়ের অভাব এদের লেগেই ছিল। এদের বাসস্থান ছিল শূকরের ঘরের মত। এরা এখন খেতে পায়, ভাল কাপড় পরে, তারপর দেখবেন এদের শোবার ঘর। কতক্ষণ ফ্যাক্টরী ঘুরে দেখলাম। কোথাও এমন কিছু দেখলাম না যার কথা এখনও মনে করলে নতুন বলে মনে হয়। বাস্তবিকই আমার মনটা একদম ভবঘুরেই হয়ে গিয়েছিল। সেই ভাবটি এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। একস্থানে দেখলাম বারুদ তৈরী করা হচ্ছে। জিনিসটা দেখেই শরীর শিউরে উঠল। অবশ্য এটা আমার কাপুরুষতারই লক্ষণ।

ফ্যাক্টরী দেখে মজুরদের থাকবার ঘরে গেলাম। এখানে এদের থাকবার একটা নতুন ব্যবস্থা হয়েছে যা চীনের অন্যত্র বড় দেখা যায় না।

প্রত্যেক মজুরকে এক একখানা রুম দেয়া হয়েছে। রুমের একদিকে একখানা খাট। খাটে একখানা পাতলা তোষক এবং তার ওপর এক খানা সাদা চাদর বিছান রয়েছে। মাথায় দেবার জন্য তুলার বালিশ। চীনদেশে তুলার বালিশ এখানেই দেখলাম, নতুবা সর্বত্রই বাঁশের অথবা কাঠের বালিশ ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক রুমেই দুটো করে টেবিল আর একখানা করে চেয়ার। একটা টেবিলে চা-এর পট এবং কয়েকটা ছোট কাপ। অন্য টেবিলে বই সংবাদপত্র এবং কালি-কলম থাকে। এখানে দৈনিক সংবাদপত্র ঘরের দেয়ালে হাতে লিখে দেয়া হয়। আমি যে চালিন-এ এসেছি সে সংবাদ এবং হাতে আঁকা আমার চিত্রও দেয়ালে দেখলাম। কাগজের অভাবই তার একমাত্র কারণ ছিল।

চীনদেশের সর্বত্র দেখা যায় দোকানে দোকানে মালপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এখানে সেরূপ ব্যবস্থা নেই। দোকানগুলি প্রায়ই খালি। দোকানে কি জিনিস ছিল তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন করে আমরা খালি গুদামে ইতস্তত ছড়ানো জিনিস দেখে বুঝতে পারি এই গুদামে হয়ত এসব মালই ছিল। খালি দোকান দেখে আমরা অনেক সময় ভুল করে বসি। মনে করি দোকানে জিনিস নেই জিনিস পাওয়া যায় না বলেই, অথবা ক্রেতার অভাবে দোকানে জিনিসই রাখা হয় না। আসলে কিন্তু বিষয়টা তা নয়। জিনিস আসা মাত্রই লোক আপন আপন দরকার মত জিনিস কিনে নেয় সেজন্যই দোকানে অবিক্রীত জিনিস পড়ে থাকে না। এখানে আমার নিজের কথাই বলছি তাতেই বিষয়টা বেশ ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। আমার সিগারেটের দরকার ছিল। একজনকে বললাম সিগারেটের দোকান দেখিয়ে দিতে, লোকটি আমাকে একটি দোকানে নিয়ে গেল। দেখলাম মস্তবড় একটা

তাকে নানারূপ সিগারেট সাজান রয়েছে। আমি এক টিন সিগারেট বাট সেণ্ট দিয়ে কিনলাম। বিদেশী বলেই আমার কাছে এক সংগে পঞ্চাশটি সিগারেট বিক্রি করা হয়েছিল, কিন্তু মাও-স্থতন্ দৈনিক মাত্র দশটি সিগারেট এই গ্রামে এসে কিনতে সক্ষম হন। এর মানে হল, সিগারেট সাধারণ জিনিস। সকলেরই দরকার হয়, এখানে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই। টাকা দিলেও জিনিস না পাবার কারণ হল, যা উৎপাদিত হয় তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই অনেকেই সোভিয়েট এলাকার বাইরে থেকে জিনিস ক্রয় করে আনবার চেষ্টা করে। এতে কোনও নিষেধ নেই। পুঁজিবাদীরা জিনিস বিক্রয় করতে কোনরূপ কার্পণ্য করে না। এরূপ কার্পণ্য না দেখাবার একমাত্র কারণ হল তারা চায় টাকা, যেদিক থেকেই টাকা আসে আসুক এতে তাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তবে পাহাড় ডিংগিয়ে যাওয়া আসা এবং পথে অপমৃত্যু বরণ করা অনেকেই পছন্দ করে না।

গ্রামের সোসিয়ালিস্ট চেয়ারম্যান বুড়ো মানুষ; তিনি আমার কাছে বসে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতেন। লক্ষ্য করে দেখেছি তিনি যেন বলতে চান, যে দেশের লোক যত বেশী অন্যায় কাজ করে সেই দেশেই ধর্মের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় তত বেশী। চীনদেশে ধর্মের মতবাদ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, এটাকে সাধারণ একটা বিষয়ের মতই করে নিয়েছে। তবুও এই বৃদ্ধের ধর্ম নিয়ে কথা বলার একমাত্র কারণ হল, তিনি জানতে চান সত্যিই কি প্রকেটিক ধর্ম এযুগে মানুষের মংগল করতে সক্ষম হবে না? স্থং পরিবার ধর্ম বদলেছে। মাও-স্থতন্ ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। মুসলমানধর্মী মা-চান্-[illegible] হয়ে মানচুরিয়াতে কমিউনিজম প্রচার করছিলেন। এতে [illegible] তাঁর শক্তি [illegible] বৃদ্ধি হচ্ছিল লোকেও তাঁকে তেমনি [illegible] [illegible]

দেখছিল। এই বৃদ্ধও গ্রাম থেকে বৃটিশ এবং সুইডিস মিশনারীদের তাড়িয়েছেন, চীনা লামাদের যেতে বাধ্য করেছেন। দরজার দেবতা, ভাগ্য দেবতা, ভূত দেবতাকে পূজা দেবার জন্য যে কাগজ মোমবাতি এবং মদের অপব্যবহার হতো তা বন্ধ করেছেন। এসব ছিল অপব্যয়; এই অপব্যয় হতে জনসমাজকে বাঁচিয়েছেন। বৃদ্ধ যাচাই করে জানতে চান এসব কাজ ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে। আমি অনেকটা সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম বলেই বৃদ্ধের কাজের প্রতিবাদ না করে প্রশংসাই করেছিলাম। বৃদ্ধ আমার কথা শুনে একটা কাগজে কি লিখলেন ও আমাকে তাতে দস্তখত করতে বললেন। আমি নিজ ভাষায় আমার নাম সই করে দিলাম। বৃদ্ধ আমাকে সংগে করে নিয়ে সেই কাগজটি গ্রাম্য সোভিয়েট গৃহে কাঠের ওপর আটা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ধর্মের গোঁড়ামিটা বেশ বেড়ে গেছে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা কোন মতেই ধারণা করতে পারা যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুরাতন আচার পদ্ধতি পরিত্যাগ করার আদেশ এসেছে সরকারের তরফ হতেই। চীন সোভিয়েটকে আমি সরকার বলতে পারব না কারণ এখানে সর্বসাধারণই রাজত্ব করছে। প্রলিটারিয়েট ডিক্‌টেটরগণ কায়েমী নন, অস্থায়ী। আজ যাকে ডিক্‌টেটর নিযুক্ত করা গেল, কাল যদি তিনি কাজ না চালাতে পারেন তবে পরশু আবার নূতন করে ডিক্‌টেটর নির্বাচন করা হয়, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের আইন সভার সদস্য এবং মন্ত্রীরা একবার ভোট বাগিয়ে নিয়ে কায়েম হতে পারলেই সময়াভাবের অজুহাতে ইচ্ছামত পর্দার আড়ালে থাকতে পারেন। সোভিয়েটের চেয়ারম্যান

এবং সদস্যেরা সেরূপ করতে পারেন না। তাঁরা নিজেদের করণীয় কাজ তো করেনই উপরন্তু সোভিয়েট পরিচালনার কাজও করেন এবং তা আনন্দের সহিতই করেন। এতে তাঁদের বেশ পরিশ্রম করতে হয়। আমাদের দেশে কেন, রুশদেশ ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই সরকারী কর্মচারীরা সরকার কর্তৃকই মনোনীত হন। সোভিয়েট দেশে তা হবার উপায় নেই। তাঁদের সর্বসাধারণের দ্বারা মনোনীত হতে হয়। সেজন্যই জনসাধারণের প্রতি তাঁদের কোন অবিচার করার অধিকার থাকে না। আর সেজন্যই অনেকে সোভিয়েটের সভ্য হতে চান না। যাঁরা অম্লান বদনে অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারেন, একদিকে জনসাধারণের কাছে মনকে জলের মত নরম রাখতে সক্ষম হন আর অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের সামনে লোহার মত শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারেন, তাঁরাই কেবল এই পদে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী হন। সেজন্যই ন্যাশনালিস্ট এবং সোসিয়ালিস্টদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। আকাশ পাতাল ভেদটা কোথায় তা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিকে জনমতের প্রতিধ্বনি কার্যকরী হচ্ছে অপরদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর উচ্চাকাংক্ষা জনমতকে দলন করে আপন স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজছে। সোভিয়েট চীন জনসমাজের, আর সনাতনী চীন চুং পরিবারের। এখানে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে, পূর্বের পুরাতনপন্থী চীন আর সোভিয়েট চীন এখন একত্রিত হয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এখন আর চুং পরিবারকে অভিসম্পাত করলে কোন লাভ হবে না। এখন চুং পরিবারের কর্ণধার চীনের কর্ণধার হয়েছেন, কমিউনিস্টরাও তা মেনে নিয়েছে। একেই বলে কালস্য কুটিলা গতিঃ।

গ্রাম মেলার কাজ অনেকটা সমাপ্ত হয়েছিল। এবার আমাকে

গ্রাম ছেড়ে হেনচো-ফৌর দিকে যাবার ইচ্ছা যদিও প্রবল হল তবুও আমি আরও কিছু দেখবার জন্য কিয়াংসির দিকে এগিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। আমার সংগে যাবার জন্য সাথীরাও প্রস্তুত হল। কিন্তু কথা হল ওদিকে তখন বড়ই মারামারি কাটাকাটি চলছিল। কে কোন মতাবলম্বী, কে কাকে হত্যা করতে চায়, কোন সরকারের প্রাধান্য রয়েছে সাথীদের তা জানা ছিল না বলেই আমার ধারণা হয়েছিল, কিন্তু সাথীরা সবই জানত। আমরা গ্রামে আরও দুদিন বিশ্রাম করলাম এবং তৃতীয় দিন গ্রাম হতে রওনা হয়ে কিয়াংসি প্রদেশের দিকে চলতে লাগলাম। পথ উঁচু নীচু এবং নানারূপ দুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ। আমার একটা ভরসা ছিল যে আমাকে কেউ অত্যাচার করবে না, কিন্তু সাথী দুজন আমার মত লোক নয়, তারা কর্মী। তাদের বিপদ আপদ লেগেই আছে। সোভিয়েট এলাকায় আমাদের ভয়ের কোন কারণই ছিল না, তাই আমরা বিনা দ্বিধায় পথ চলতে লাগলাম।

চালিন-এর পূর্বদিকের গ্রামগুলিতেও সোভিয়েট স্থাপন হয়েছিল কিন্তু তখনও এদিকে রীতিমত কাজ চলছিল না। লোকের অভাব বেশ অনুভব হয়েছিল। যারা যুদ্ধের অজুহাতে দুপয়সা করে নেবার সুযোগ খুঁজছিল তাদেরও এদিকে আসা যাওয়া ছিল। উত্তরদিক হতে পুরাতন মতবাদী চীনাদের অধীনে যে সকল "ইরেগুলার" সেপাই ছিল তাদেরও উৎপাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশে শান্তি ছিল না বললে কোন দোষ হয় না। চীনারা এরূপ অশান্তিতে অনেকদিন থেকে অভ্যস্ত ছিল বলেই নতুন অশান্তিকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করছিল। কিন্তু অশান্তি জিনিসটা বড়ই কষ্টের, সেইটিই বার বার আমার দৃষ্টিতে এসে পড়ছিল। এখানে তার একটি নমুনা দিচ্ছি।

আমরা একটি রেঁস্তোরাতে গিয়ে বসে খেতে লাগলাম। সাথীরা

নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং আমাকেও রেঁস্তোরার মালিকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রেঁস্তোরার মালিকের অশান্তিপূর্ণ চাহনি বার বারই আমার সাথীদের ওপর পড়ছিল। সুখের বিষয় আমরা খাবার এবং থাকবার বেশ সুযোগ এবং সুবিধা পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের পর যে একদল লোক এসেছিল তাদের প্রতি রেঁস্তোরার মালিকের খরদৃষ্টি দেখেই মনে করেছিলাম এদের প্রতি লোকটি ভাল ব্যবহার মোটেই করবে না। সে দুখানা হাত পেছনের দিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে বলছিল—ব্যবসা করাটা আমার পেশা, কিন্তু ব্যবসা করার মত মাল না পেলে কি করে ব্যবসা করি? আমাদের এখানে মুনাফা করা হয় না এই সুযোগ নিয়ে যদি অন্যস্থানের লোক এসে বাড়াবাড়ি করে তবে আমাদের আইনের সাহায্য নিতেই হবে। বেশী আর কথা হল না। যারা খেতে এসেছিল তারা গোপন পকেট হতে অস্ত্র বের করল এবং রেঁস্তোরাওয়ালাকে আক্রমণ করবে বলে ভয় দেখাল। সাথীরা আমাকে নিয়ে বাইরে দাঁড়াল। হঠাৎ ঘরের ভেতর হতে কয়েকজন সেপাই বের হয়ে এসে বেশ গুলি চালাতে শুরু করল। নিমিষের মধ্যে রেঁস্তোরা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হল। ভাত খাওয়ার পরিবর্তে অনেকে খেল পিস্তলের গুলি। যারা পিস্তলের গুলি খেল তাদের ক্ষুৎপিপাসা চিরতরে লোপ পেল।

এদিকে ভ্রমণ করাটা মোটেই ভাল লাগল না। পর্যটক এহেন মারাত্মক অবস্থার মধ্যে থাকতে মোটেই রাজি নয়। তারপর সাইকেল নিয়ে আমি মহাবিপদে পড়েছিলাম। এদিকে সাইকেল চালান বড়ই কষ্টকর। পথঘাট নেই বললেও চলে। হেনচো-ফৌর দিকে ফিরে যাওয়াই সংগত বিবেচনা করলাম কিন্তু সাথীরা তাতে রাজি হল না। তারা সাইকেল রেঁস্তোরায় রেখে যাবার বন্দোবস্ত,

করতে লাগল। আমিও আর তাতে বাধা দিলাম না, কিন্তু সেই রাত্রটি এখানে না থাকাই আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সাথীরা যখন বুঝল এখানে রাত কাটাতে আমার একান্তই অনিচ্ছা তখন অগত্যা তারা আমাকে নিয়ে অন্তগ্রামের দিকে চলল। আমরা পায়ে হেঁটেই রওনা হলাম, সাইকেলের কথা সাময়িকভাবে ভুলতেই হল। আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই অন্য এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এখানে অনেকগুলি সেপাই জড় হয়েছে। গ্রামের লোক তাদের জন্য পাক করেছিল। তাদের খেতে বসবার পূর্বেই আমরাও গিয়ে উপস্থিত হলাম। খাওয়াটা তাদের সংগেই হল। থাকবার আমাদের অসুবিধা হবার কথাই ছিল কিন্তু একটু রাত হয়ে যাবার পরই সেপাইএর দল কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমরা একখানা হোটেলে গিয়ে স্থান নিলাম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবছিলাম। বেশীক্ষণ ঘুমাতে পারলাম না, উঠে বসলাম। একজন সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিক্রিয়াশীল সরকার জাপানীদের কি সমুদয় দেশটাই দিয়ে দিতে চান? তিনি বললেন—অনেকটা তাই। আপনি যখন মানচুরিয়াতে যাবেন তখন দেখবেন মানচুরিয়ার সংগে আমাদের অতি নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। ডোভারকে যদি ইংলণ্ডের বাইরে বলা যায় তবে মানচুরিয়াকেও চীনের বাইরে বলা যেতে পারে। আমি আরও চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার মনে হয় আপনাদের শত্রু ঘরে বাইরে বর্তমান, উভয় শত্রুকে দমন করা আপনাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। সাথী বললেন, কথাটা ঠিক বটে তবে তার উত্তর দেওয়া চলে না। তার উত্তর যা হবে তা খাঁটি পলিটিক্স। আপনার সংগে আমরা পলিটিক্স আলোচনা করব না।

এ বিষয় নিয়ে পরে পিকিনে একদিন আলোচনা হয়েছিল। পিকিনের কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁরা যেনতেন-প্রকারে জেনারেল চিয়াং কাই-শেককে দলে ভিড়াবেনই এবং তাঁর বর্তমান মত পরিবর্তন করাবেনই। জেনারেল চিয়াং কাই-শেককে দলে না আনতে পারলে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভবপর হবে না এটা তাঁরা বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি শুধু থিসিস কপচিয়ে সময় না কাটিয়ে থিসিস যাতে কার্যকরী হয় তার চেষ্টা করেন এবং ১৯৩৭ সালের শেষভাগে তাঁরা যা করতে চেয়েছিলেন তাতে সফলকাম হন। জেনারেল চিয়াং কাই-শেক মত বদল করেন কিন্তু কমিউনিস্ট দলের সাহায্যে তিনি জাপানের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার পূর্বেই জাপানীরা চীনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

যাক এখন আবার পূর্বের কথায় ফিরে আসি। রাতটা আরামে কাটিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ফের আমরা পথে বের হলাম। এবার আমরা কোন দিকে যাচ্ছি অথবা কোন বিশেষ স্থানে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না, শুধু ভাংগা এবং গড়ার মাঝে কমিউনিজম কি করে বিস্তার লাভ করছে তাই লক্ষ্য করতে লাগলাম। কোন কিছু জানতে হলে ধৈর্য ধরতে হয় এবং পরিশ্রমও করতে হয়। আমার অভ্যাসই হল পথে চলার সময় কোন কঠিন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। আমি চলতে চলতে ভাবছিলাম এত শত্রুর মাঝে কি করে মাও-সুতন-এর নবজাত সোভিয়েট এখনও বেঁচে থাকতে সক্ষম হচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন বিশ্রাম করতাম তখন চিত্র এঁকে সাথীদের দেখাতাম—এতগুলি শত্রু আপনাদের আছে, এ সব শত্রুকে জয় না করলে আপনাদের বেঁচে থাকবার কোন উপায়ই দেখছি না। কয়েকদিন ভ্রমণ করার পর সাথীরা আমার প্রশ্নবাণে অস্থির

হয়ে বলেছিলেন—আমরা মরি বাঁচি তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু যে সকল স্থানে সোভিয়েট স্থাপন হয়েছে সে সব স্থানের অধিবাসীরা বুঝতে পেরেছে সোভিয়েট কাকে বলে। সোভিয়েট হল অমৃত তুল্য, একবার যারা অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে তারা যাতে বরাবর তা পেতে পারে তার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে। একবার যদি সোভিয়েট প্রথা চলেও যায় আবার যাতে সোভিয়েট প্রথা ফিরে আসে সেজন্য তারা নিজেরাই চেষ্টা করবে।

লোকে বলে লেখনী চমৎকার জিনিস। লেখনীর সাহায্যে অজানাকেও জানাতে পারা যায়। আমি কিন্তু অজানাকে জানাতে পারছি না। সোভিয়েট দেখবার স্থান, জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত স্থান, পৃথিবীর শান্তির স্থান, কিন্তু কিছুই যে প্রকাশ করতে পারছি না। এটা হয়ত লেখনীর দোষ নয়, এটা দেশ কাল পাত্রের দোষ। অতএব সোভিয়েট চীনের কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যতই সোভিয়েট চীন দেখছিলাম ততই মনে হচ্ছিল কবে পৃথিবীশুদ্ধ সোভিয়েট হবে। এরূপ চিন্তা করা আমার পক্ষে অন্যায় হয়নি। যদি কেউ কোন ভাল জিনিস বিদেশে গিয়ে পায় তবে তাই দেশে নিয়ে আসে দেশের লোককে দেখাতে, তা খাদ্য হলে দেশের লোককে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু সোভিয়েট খাদ্য নয় যে কিনে এনে বিলিয়ে দেব দেশবাসীকে। সোভিয়েট কিনতে পাওয়া যায় না, সোভিয়েট গড়তে হয়।

নতুনের পত্তন করতে হলেই শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। চালিন সোভিয়েট গড়তে গিয়ে মাও-স্থতন অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। অধিক পরিশ্রমের জন্য তাঁর শরীর দুবার ভেংগে যায়। চীনারা যতটা পরিশ্রম করতে পারে ততটা ভারতবাসীর দ্বারা সম্ভব হয় না। ওয়াং যখন মাও-এর কথা আমার কাছে

বলতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাতের বৃদ্ধ আঙুলটি দেখিয়ে বলতেন মাও-এর মত কর্মবীর চীনদেশে আর জন্মায় নি। অনেক সময় তিনি বলতেন পৃথিবীতে যত বীরপুরুষ জন্ম নিয়েছেন মাও সকলের অগ্রগণ্য। আমি তাতে যখন প্রতিবাদ করতাম তখন ওয়াং বলতেন চীনদেশ শত ভাগে বিভক্ত। বিদেশীরা চীনের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করছে, এমনি অবস্থায় চীনে সোভিয়েট গঠন করা শুধু মাও-সুতনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

আমি কাজ করেছি পল্টনে, শুধু হুকুম তামিল করতেই শিখেছি, কিন্তু কি করে হুকুম দিতে হয় তা আমার অজ্ঞাত। মাও-সুতন আদেশ দেওয়া এবং আদেশ মানা উভয় দিকেই কৃতত্ব দেখিয়েছেন। তারপর কমিউনিস্ট পার্টির লোক কোন কথা সহজে মেনে নিতে চায় না। তারা যখন কোন কাজে হাত দেয়, তখন তার আগে কাজের ধারা ও উদ্দেশ্য ভাল ভাবে ঠিক করে নেয়। সেই সময় ভয়ানক তর্কযুদ্ধ হয়। এই তর্কযুদ্ধে যে জয়ী হয় তাঁর কথাই সকলে মেনে নেয়। মাও-কেও অনেক সময় তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছে। তর্কযুদ্ধ কর্মযুদ্ধের ভূমিকা। যারা ঠিক ঠিক কর্মী তারা দাসভাবের আওতায় থাকে না, সেজন্য মাও-কে কমিউনিস্ট পার্টিও একবার পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মাও-এর কমিউনিস্ট দল পরিত্যাগ করার কারণ ওয়াং আমার কাছে প্রায়ই বলতেন কিন্তু তাঁর কথায় বেশী কান দেইনি। তবুও যেটুকু মনে আছে তাই বলা দরকার মনে করি।

মাও কৃষক মজুরদের মধ্যে কাজ করতে ভালবাসতেন। ভারতবর্ষে কৃষক মজুর আমি অতি অল্পই দেখেছি। তারাও আবার ঠিক ঠিক কৃষক মজুর নয়। কৃষক ও মজুরের মধ্যে প্রায়ই আত্মীয়তার বন্ধন থাকে সেজন্য ভারতের কৃষক মজুরের সংগে চীনের এবং অন্যান্য উন্নতিশীল

দেশের কৃষক মজুরের কোনরূপ তুলনা হতে পারে না। ভারতে আছে শুধু কৃষক। এখানে এসব কথা আমি বিশেষ করে বলতে যাব না কারণ এতে আসল কথা চাপা পড়বে এবং বইএরও কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে। মাও কৃষকদের সংগে থাকতেন এবং তাদের ভেতরে গঠন কাজ চালাতেন। এই কাজের সময় তিনি এমনি ভাবে কথা বলতেন যাতে করে কৃষকদের মানসিক উন্নতি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কৃষক মজুরদের সংগে থাকলেই বুঝতে পারা যায় তাদের অভাব এবং অভিযোগ কোথায়। তিনি তাদের সংগে থেকে তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের অভাব এবং অভিযোগের কথা বলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ সব কারণেই তিনি কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট দল তখনকার দিনে বিদ্রোহ পছন্দ করতেন না। ফলে জলন্ত আগুন স্তিমিত আগুন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। মাও দক্ষিণ চীনের চারিদিকে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ আনয়ন করেন।

ওয়াং আমাকে বলেছিলেন মাও-এর বিদ্রোহের ফলে অনেক লোক অকালে মরেছে, অনেক শহর ও গ্রাম একদম লোপ হয়ে গিয়েছে। অনেক শহর রক্তের স্রোতে ভেসে গেছে। মাও তখন ছিলেন উগ্রপন্থী, বিদ্রোহ যেন তাঁর মজ্জাগত ছিল। এই বিদ্রোহের ফলেই চালিন-এ সোভিয়েট গড়ে ওঠে।

ক্যাণ্টনের পুলিশ কমিশনারকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—বলুন ত মশায়, কমিউনিস্টরা গ্রাম এবং শহর ধ্বংস করে কেন? কমিশনার ছিলেন নিজেই কমিউনিস্ট তাই বলেছিলেন,—কমিউনিস্টরা কখনও গ্রাম এবং শহর ধ্বংস করে না, যারা কমিউনিস্টদের শত্রু তারাই গ্রাম এবং শহর ধ্বংস করে। বাস্তবিক আমি স্বচক্ষে দেখেছি

কমিউনিস্টরা গ্রাম ধ্বংস করা দূরের কথা গ্রাম যাতে রক্ষা পায় তারই দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশী।

মাও-এর একটি খাঁটি দুষমনের সংগে আমার দুবার দেখা হয়। তাঁর নাম উ। উ-এর সংগে যখন আমার নানকিনে দেখা হয় তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—মাও-এর সংগে আপনার দেখা হয়েছিল?

মাও কে?

সেই ডাকাতের সর্দারটা।

তাঁর সংগে আমার অনেকবারই দেখা হয়েছে। তিনি ত খারাপ লোক নন, অনেক সময় আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সহকারীরা আমাকে অনেক সময় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কিসের জন্য যে আপনারা এমন লোককে ডাকাত বলেন তা ত আমি বুঝতে পারি না?

বুঝবার দরকার নেই, লোকটার মুখ বড়ই মিষ্টি, অন্তরটা ভয়ানক খারাপ, মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের সর্বনাশ করাই তার পেশা।

এর বেশি আর কথা হয়নি। পথে দাঁড়িয়ে একজন লোক আমাকে ডাকছিলেন, তিনি একজন ভারতীয়। তাঁর ডাক আমি অবহেলা করতে পারিনি। আমার মনে হয় আমাকে তিনি ডেকে ভালই করেছিলেন। হয়ত আমি রাগের মাথায় উ-কে অন্যায় কথাও কিছু বলে ফেলতাম। পথে এসে বৃদ্ধ সর্দারজীর সংগে আমার দেখা হল, তিনি আমাকে পেয়েই বললেন—এ লোকটা ভয়ানক অসৎ, এর সংগে কখনও কথা বলবেন না। লোকটা আমাদেরও সর্বনাশ করতে বসেছে। এ লোকটার ঘরে যাবেন জানলে আমি আপনাকে আসতে দিতাম না। এর পরও ও আমার সংগে কয়েকবার দেখা করেছিলেন; তখন আমি ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধেই বেশি কথা বলতাম। কারণ উ ইংলিশ ভাল জানতেন না।

পরে তাঁর সংগে আমার লণ্ডনে দেখা হয়। একজন বাংগালী ভদ্রলোক আমাকে তাঁর সংগে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেন। দেখা মাত্রই আমরা একে অন্যকে চিনতে সক্ষম হলাম। আমিই এবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ডাকাত এবার পালিয়েছে, না?

হাঁ।

কিন্তু এ ডাকাতকে আপনারা আর কাবু করতে পারবেন না, সর্বসাধারণ যার পেছনে রয়েছে, সর্বসাধারণকে যে সাহায্য করছে তাকে আপনারা হত্যা করার বন্দোবস্ত করছেন, তা কি ভাল কথা? চু-তে কেমন আছেন?

তাঁকে জীবন্ত অথবা মৃতাবস্থায় ধরে যে এনে দেবে তাকে পঞ্চাশ হাজার চীনা ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

চীনসম্রাটও একদিন ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেনের জন্য সেরূপই একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

আপনি কি কমিউনিষ্টদের পছন্দ করেন?

আপনি নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পছন্দ করেন নতুবা এখানে আড়াই শিলিংএর টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে আসতেন না।

তাইত বিষয়টা বড়ই গোলমেলে।

এখন আপনার বোধ হয় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, কিন্তু এটা থাকবে না, বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন?

সিনেমা শুরু হয়ে গেল। আর কথা হলো না। সিনেমা সমাপ্ত হবার সংগে সংগেই উ লোকের ভিড়ে গা ঢাকা দিলেন। তাঁর সংগে আর দেখা হয়নি।

মাও-এর আরও দুষমন ছিল, তাদের কথা এখানে আর না বলাই ভাল। ব্যক্তিগত আক্রমণ আমার মোটেই ভাল লাগে না। তবে

এটা বুঝেছি যারা মাও-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা স্বেচ্ছায় করেনি। এটা তাদের মানসিক দুর্বলতা। যাদের মন দুর্বল তারাই সৎকাজ অর্থাৎ সমাজের সেবা পরিত্যাগ করে ব্যক্তিগত লাভের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ত্যাগীর সংগ পরিত্যাগ করে।

একদিন আমি ওয়াংকে বললাম—আমাদের দেশের লোক প্রায়ই আমাকে ভবঘুরে বলে থাকে সেকথাটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। ওয়াং বললেন—যারা প্রথম সোভিয়েট স্থাপন করেছিল দক্ষিণ চীনে, তারা সকলেই ছিল ভবঘুরে দলের সভ্য। আমার তখন থেকে ইচ্ছা হয়েছিল ভারতেও একটা ভবঘুরেদের ক্লাব করি কিন্তু কর্মশক্তি লোপ পাওয়ার সংগে সংগে সেসব বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

আমাদের দেশে যেমন অনেক ডাকাতের প্রশংসা লোকে করে থাকে, তেমনি চীন দেশেও দুটি বিশিষ্ট ডাকাতের নাম সর্বসাধারণ প্রায়ই করে থাকে। তারা খাঁটি ডাকাত ছিল। কখনও তারা কাউকে দয়া মায়া দেখাত না। যাকে পথে পেত তাকেই প্রথম হত্যা করত তারপর তার পকেটে কি আছে তা দেখত। এই ডাকাতরা গ্রাম লুট করে গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিত। এরূপ ডাকাতও মাও-এর কাছে শিক্ষা পেয়ে সৎকর্ম করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ শেষটায় লালফৌজের কাপ্তেন পর্য্যন্ত হয়েছিল। ওয়াং আমাকে এই গল্পটি বলবার সময় তাঁর মুখের ভাব এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল যে তাঁর মনের উত্তেজনা ধরতে কিছুমাত্রও বেগ পেতে হয়নি। চুরি ডাকাতি এসব মানুষ দায়ে পড়েই করে, অন্যরা কখনও কুকর্ম করে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী তা বুঝে না। তারা চোর ডাকাতকে ধরে শাস্তি দেয় অথচ লোক যাতে অভাবে পড়ে

অন্যায় কাজ না করে তার কোন ব্যবস্থাই করতে সমর্থ হয় না। চু-তে ছিলেন আফিংখোর। তিনি কমিউনিজমের সন্ধান পেয়ে অতিকষ্টে আফিং ছাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। কে জানত এই চু-তেই ভবিষ্যতে একদিন চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য অগ্রণী হয়ে দাঁড়াবেন। ওয়াং আমাকে প্রায়ই চু-তে এবং মাও-এর কথা বলতেন। তাঁর কথাই মনে জাগত কিন্তু এই দুটি লোকের কর্মশক্তির কথা মোটেই তখন বুঝতে সক্ষম হতাম না, সেজন্যই তাঁদের সম্বন্ধে 'মরণ বিজয়ী চীন'এ কিছু লিখতে পারিনি।

পৃথিবী ভ্রমণ করার সময় চীনদেশে দেখেছি জাপানীরা বিদ্রোহী চীনা যুবকদের বিপথগামী করার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখায়। প্রলোভনে অনেকে মজে যায়, আর ভুলে যায় নিজের কর্তব্য। সেজন্যই চীনের যুবক যাঁরা দেশের কাজ করতেন এবং এখনও করে থাকেন, তাঁদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়মগুলির কয়েকটি আমি শুনেছিলাম। কিন্তু পরাধীনতা যারা মর্মে মর্মে অনুভব করে তারাই সে সকল নিয়ম পালন করতে। অন্য লোক সেই নিয়ম-কানুনকে পালন করতে সক্ষম হয় না। সেই নিয়ম-কানুনের একটু আভাস এখানে দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। তোমার মা যদি কলেরা রোগে আক্রান্ত হন এবং তোমাকেই তোমার মার সেবা শুশ্রূষা করতে হয় তবে তুমি কি আড্ডা দিতে বাইরে যাবে? নিশ্চয়ই যাবে না। চীনের কর্ম্মী যুবক যুবতীরা জাতীয় মুক্তিকে সে ধরণেরই কিছু একটা বলে ভাবে। সেজন্যই চীন আজও দাঁড়িয়ে লড়ছে।

আমরা চলছিলাম পার্বত্য পথ ধরে। উর্দ্ধ আকাশে সুন্দর মেঘমালা হুহু করে উড়ে যাচ্ছিল, কখন বা সেই মেঘমালার অন্তরালে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। আমি ছিলাম নীরব। একজন বলছিল—ঐ

দেখ বন্ধু, এ দিকেই নান-চাংএর পথ। পাহাড় ডিংগিয়ে যাবার পর আসবে একটা সমতলভূমি, তারই পাশে প্রকাণ্ড হ্রদ, তারই তীরে নানচাং। কত বড় শহর। বোধ হয় কেণ্টনের মতই হবে। প্রাণ সেদিকেই যেতে চায়। সেদিকেই কোথাও নাকি সোভিয়েটের কেন্দ্র গড়ে উঠবে। যখন সোভিয়েট গড়ে উঠবে তখন আমরা নিশ্চয়ই সেখানে যাব, এবং সেখানে গিয়ে কার্জ করব। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম—যদিও আমি চলবার সময় কথা বলি না তবুও বলছি যখনই কথা বলবেন তখনই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করবেন। ইংরেজী ভাষা খারাপ নয়, ইংরেজী ভাবার ওপর আমার কোনরূপ বিরাগ নেই। সাথীরা হেসে বললেন—এরই মাঝে ভাবের পরিচয় পেয়ে সুখী হলাম। এরা ছাত্র। ওরা চাচ্ছে কি করে আমার মনের সংকীর্ণতা কেটে গিয়ে মনটা বড় হয়। যখন দেখল তাদের পরিশ্রম সার্থক হচ্ছে তখন তারা আনন্দিত। কর্মীর আনন্দ এখানেই। যারা বলে একঘেয়ে কাজ করাটা অতি কষ্টকর, বুঝতে হবে তারা এখনও কাজের আস্বাদ পায়নি, তারা কর্মী হতে পারেনি।

আসল কথায় আসা যাক। ঐ পাহাড়ের উপর পাহাড় লহর বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে গাছ নেই, আছে শুধু ঘাস। কেন গাছ নেই তা বিবেচ্য বিষয়। জাপানীরা বলে চীনারা গাছ কেটে ফেলেছে, এসব পাহাড়ে গাছ রোপণ করতে হবে। আর চীনারা বলে গাছ কোনদিন পাহাড়ে জন্মেনি, হয়ত জন্মাবে না। আমি বলছিলাম, কেউ কি এ পাহাড়ে গাছ রোপণ করেছিল? উত্তর পেলাম, কেউ গাছ রোপণ করেনি। গাছ রোপণ করতে হবে। পাহাড় বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ করতে হবে। চীনদেশকে ফুল পাতা দিয়ে সাজাতে হবে। কিন্তু এখন

নয়, এখন চীনদেশকে গড়তে হবে, পাপীদের নিপাত করতে হবে তারপর আসবে সেসব কথা।

সম্মুখেই পাহাড়ে পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। আমরা সেপথে এক পা এক পা করে এগুতে লাগলাম। ঐ গ্রাম। গ্রামে খাদ্য আছে, শোবার স্থান আছে। আমরা দুটোই পাব। গ্রাম সুন্দর। দূর থেকেই সাজানো বড় বড় ঘর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। গ্রাম থেকে ধোঁয়া আকাশে উঠছে, নিশ্চয়ই কেউ পাক করছে। গ্রামে হোটেল আছে। ঐ দেখা যায় হোটেল। আমাদের পা এগিয়ে চলল। পা দুখানাকে যেন গ্রাম ডাকছে আর পা আমাদের অজ্ঞাতেই আপনি সবেগে চলে যাচ্ছে। পা যেন আমাদের নয়। গ্রামের যেন পৃথক প্রাণ আছে।

কিন্তু গ্রামে এসেই চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। গ্রামে মানুষ নেই। গ্রামে কিছু ঘটেছিল যার ফলে গ্রাম ছেড়ে লোক পালিয়েছে। আশা আমাদের গ্রামে নিয়ে এসেছিল কিন্তু আশায় ছাই পড়ল। গ্রামের লোক সোভিয়েটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ কেনই বা না করবে? যুগযুগান্তর ধরে বিনা পয়সায় মজুর খাটাচ্ছিল, তিন পয়সার জিনিস এক পয়সায় কিনছিল, বড়লোক বলে, বনেদী ঘর বলে অহংকার করছিল, তারা কি করে ছোটলোকের দলকে প্রশ্রয় দেবে? তা হতে পারে না তাই তারা বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু এবার ছোটলোকের দল বড় হয়েছে, বড়লোক ওদের সংগে পেরে উঠছে না তাই পালিয়েছে। আমরা গ্রামে গেলাম।

গ্রামের অনেকগুলি বাড়ি ঘুরে দেখলাম। সর্বত্র লোক দরজা বন্ধ করে ঘরেতেই আছে। ডাকাডাকি করাতেও দরজা খুলল না। খাবারের দোকানে খাবার আছে অথচ খাবার দেবার লোক নেই।

হোটেলে বিছানা আছে লোক নেই। মাঠে লাংগল আছে লোক নেই। পথে শূকরের দল বেড়াচ্ছে অথচ লোক নেই। সাথীরাও পথিক সাজল। আমরা খাবারের দোকানে গিয়ে নিজের হাতেই খাবার নিলাম, যখন খেতে বসলাম তখন একজন লোক বলল, খাবার খেও না, ডাকাতরা তোমাদের কেটে ফেলবে। এই মাত্র এরা গ্রামের ভেতর দিয়ে গিয়েছে হয়ত এখুনি ফিরে আসবে। আমরা বললাম— আমরা বিদেশী পর্যটক, আমাদের দুষমন নেই এ দুনিয়ায়। বলত কত দিতে হবে? দোকানী হাত পাতল, আমরা তিনজনের খাবারের জন্য যাট সেণ্ট দিলাম।

খাবার খেয়ে আমরা স্থান ত্যাগ করিনি। বসেই রইলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল কোনও একটা হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করি। সে কথা সাথীদের বলতে সাথীরা আমাকে একটি হোটেলে নিয়ে যায়। হোটেল একদম খালি। মালিক কোথায় পালিয়েছে। আমরা একটি রুমে গিয়ে একটি বিছানাতেই সব শুয়ে পড়ি। পরিশ্রমে কাতর হয়েছিলাম বলে আমরা তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাংগল তখন গ্রামে লোক ফিরে এসেছে। হোটেলের মালিকও ফিরে এসেছিল কিন্তু আমাদের ঘুম ভাংগায় নি। চীনারা জানে ঘুমের মূল্য কত।

হোটেল হতে বের হয়ে আমরা ডাকাতদের স্বরূপ জানবার জন্য অনেককেই নানা প্রশ্ন করি, কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। একজন লোককে সাথীরা জিজ্ঞাসা করেছিল—তবে তুমি কিসের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলে? লোকটি সে কথারও কোন উত্তর দেয়নি। আমাদের দেশের অনেকে নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—এর কারণ কি? এর একটি কারণ আছে যার কথা আমরা শুনেছি কিন্তু অনুভব

করিনি। তাকে বলে পলিটিক্স। তুমি কোন দলের লোক্ তা আমি জানি না অতএব তোমার কাছে আমার বলারও কিছু নেই। আমাদের দেশে যেমন করে হিন্দু মুসলমান আমরা চিনতে পারি, চীনদেশে তা হয় না। চীনদেশে সকলের পোষাক একই রকমের। তারপর এটা শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণীসংগ্রাম বড়ই মারাত্মক। হিন্দুর কাছে মুসলমানের রেহাই আছে। মুসলমানের কাছে হিন্দুর নিরাপত্তা আছে। ধর্মের মত বদলাতে আজকাল শিক্ষিত সমাজের কোন সংকোচই হয়না, কারণ এখন শিক্ষিত সমাজ জেনে গেছে ধর্মের পেছনে এমন কিছু নেই যার জন্যে ভবিষ্যতে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামে লাভ লোকসানের খতিয়ান ঘাটতে হয়। এতে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। সামান্য এক টুকরা জমির জন্য যেমন করে ভাই ভাইকে হত্যা করে ঠিক সেরূপ শ্রেণী-সংগ্রামের পেছনে রয়েছে জমি বাড়ি, ভাত কাপড়, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত ইত্যাদি—মানুষ যার জন্য লড়ে, মরে, কত কিছু করে। আমাদের দেশে এখনও শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, সেজন্যই শুধু একে অন্যে বিবাদ হয়, মোকদ্দমা হয়। কিন্তু চীনদেশে শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাই আদালতের বিচারে তার মীমাংসা হচ্ছিল না। তার মীমাংসা হচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে একের রক্তের সংগে অন্যের রক্ত মিশিয়ে।

ডাকাতের দল কিন্তু গ্রামের বিশেষ কিছু অনিষ্ট করেনি। আমার মনে হচ্ছিল—এরা ডাকাত নয়, এরা যেন কোথাও আক্রমণ করার জন্য বেগে চলে যাচ্ছিল। আমি সাথীদের বললাম—ডাকাতের ভয় মনে স্থান দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়, আমরা আজ এখানেই থাকব। সাথীরা আমার কথায় রাজি হলে এবং আমরা গ্রামেই থেকে গেলাম। রাতটা আমাদের নিরাপদেই কাটল।

পরের দিন আমরা আরও এগিয়ে গিয়ে একটি শহরে পৌছলাম। এখানে তখনও সোভিয়েট স্থাপন হয়নি। শহরটী ছোট্ট এবং লোকসংখ্যা অতি অল্প। তবে সোভিয়েট স্থাপন হবে বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। ধনীরা এর মধ্যেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিল। স্কুলের পতাকাদণ্ডে লাল ঝাণ্ডাই পত পত করে উড়ছিল। লোক সন্ত্রস্ত ছিল। শহরের লোক আমাকে পেয়ে খুশি হয়েছিল।

বিকাল বেলা আমার লেকচারের বন্দোবস্ত হয়। আমি বলছিলাম আমার ভ্রমণ-কথা, আর অনুবাদক বলছিল বিদ্রোহের কথা। সকল সময় লোক ভ্রমণ-কথা শুনতে পছন্দ করে না। তাদের শহরে আসছিল পরিবর্তনের বিপ্লব। তারা জানতে চেয়েছিল কেণ্টনের লোক কি করছে, তারা কি কমিউনিস্টদের কাছে মাথা নত করেছে? যদি মাথা নত না করে থাকে তবে তাদের দিন কি ভাবে কাটছে? এসব কথাই ছিল তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। অনুবাদকরা কি বলতেন তা লেকচারের পর আমাকে সংক্ষেপে বুঝাতেন। আমি বেশ ভাল করে বুঝতাম আমি যা লেকচারে বলেছি তা তাঁরা কিছুই বলেননি, বলেছেন অন্য কিছু। লেকচার হয়ে যাবার পর যাঁরা একটু আধটু ইংলিশ জানতেন তাঁরাই আমার কাছে এসে ভিড় করতেন। আমি তাঁদের সংগে কথা বলে আরাম পেতাম। অনেক সময় আমার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়ে যেত যা তারা লিখে নিতে পছন্দ করতেন। সেদিন লেকচারের পর আমার কাছ থেকে অনেকে অনেক সংবাদ লিখে নিয়ে ছিলেন। শহরটির আবহাওয়া আমার কাছে বেশ ভালই লেগেছিল। ইচ্ছা ছিল এখানে কয়েকদিন থাকি কিন্তু সাথীরা তাতে মোটেই রাজি হননি। তাঁরা শহরে থাকাটা মোটেই পছন্দ করেন না। আমাকে তাঁরা স্পষ্ট করে বলেছিলেন শহরে থাকা তাঁদের পক্ষে

মোটেই নিরাপদ নয়। তাঁরা পর্যটকরূপে অধিক সময় নিজেদের পরিচয় দিতে ভালবাসতেন না।

তাঁদের কথামত আমি শহর ছাড়তে বাধ্য হই এবং গ্রামের দিকে রওনা হই। এদিকের গ্রামগুলি বড়ই ছোট এবং গ্রামের লোকসংখ্যাও বেশি নয়। এতে আমাদের চলার পক্ষে বেশ সুবিধাই হয়েছিল। একা চলা আমার অভ্যাস। একা চললে অনেকের সংগে নানা কথা হয়। কিন্তু এঁরা সংগে থাকায় আমার ইচ্ছা মত কারো সংগে কথা হচ্ছিল না। আমার শরীরে ছিল শক্তি, মনে ছিল জানবার বাসনা। এঁরা সংগে থাকায় মনে হচ্ছিল যা জানতে চাইছি তা যেন জানা হচ্ছে না। লোক যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আমার মাঝে যেন দাম্ভিকতা এসে দেখা দিচ্ছে। যখনই দাম্ভিকতা এসে দেখা দেয় তখনই জানবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যাঁরা লোকের সংগে না মিশে পর্যটন করেন তাঁদের লেখার মত মাল মশলার অভাব হয়। আমার তা হয় না কারণ আমি অনিচ্ছায়ও লোকের সংগে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। পর্যটন একদিকে যেমন সুখের কিন্তু তার পেছনে যে দুঃখ রয়েছে তা যদি মাথা পেতে না নেওয়া হয় তবে পর্যটক-জীবনের সার্থকতা হয় না।

আমরা চলেছিলাম একটি নদীর তীর ধরে। পথ যদিও আরামেরই ছিল তবুও মনে হতো ঠাণ্ডা যেন আমার বুকে পিঠে বেশ ভাল করেই লাগছে। হয়ত জরও হতে পারে। এদিকে ম্যালেরিয়া একদম নেই। আমার ভয় হচ্ছিল এরূপভাবে চলাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, তাই আমরা একখানা নৌকা ভাড়া করে কিয়ানফু-তে যাই।

কিয়ানফুঁ

কিয়ানফুঁ-তে গিয়ে আমরা একটি ভাল হোটেলে উঠি। হোটেলের পাশ দিয়েই একটি বড় রাস্তা চলে গেছে। বড় রাস্তায় বিকাল বেলা অনেকগুলি যুবক যুবতী মিছিল করে চলেছিল। তাদের হাতে কোনরূপ পতাকা ছিল না। তারা মার্চ করতে করতে নানারূপ ধ্বনি উচ্চারণ করছিল। এরা চলে যাবার পর সাথীদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরা বলছে—এরূপ করে যদি ন্যাশানাল সরকার চলেন তবে জাপানীরা চীনকে ধীরে সুস্থিরে একদম হজম করে ফেলবে, অতএব ছাত্ররা জাগো, চীনকে বাঁচাও। ছাত্রদের মধ্যেও অনেক পুরাতন মতবাদী আছে। অনেকে যখন জানল আমি কিয়ানফুঁ-তে এসেছি তখন তারা দল বেঁধে আমার কাছে হাজির হল এবং নানা প্রশ্ন করতে লাগল। যারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় তারাই আমার ধমক খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আমার আবার মাথার ঠিক থাকে না সকল সময়। হঠাৎ চিৎকার করে বললাম—এরাই শয়তান, এরাই চীনের শত্রু, এরূপ শত্রুর প্রতি দয়া দেখান মোটেই উচিত নয়। যারা আমার কাছে বসেছিল তারা নতুনের উপাসক। তারা আমাকে ভাল বেসেছিল, নানারূপ গল্প করছিল, তারপর আমার খাবারের বেশ আয়োজনও করল।

আমি তখনও শূকর মাংস বেশি করে খেতে পারতাম না। রাত্রে খেতে বসে দেখি পোলাও রান্না হয়েছে এবং তাতে নরম মাংস রয়েছে। কোনরূপ দ্বিধা না করেই খেতে লাগলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে সামনুতে

চুমুক দিতে হয়েছিল। সামসু কড়া মদ। আমাদের দেশের ধেনো মদ হতেও কড়া। সামসু সেদিন আমাকে সাহায্য করেছিল নতুবা যা খেয়েছিলাম সবই বোধ হয় পেট হতে বেরিয়ে আসত। এ জীবনে অনেক দিন বমি করেছি, কিন্তু অনেক লোকের সংগে খেতে বসে এরূপ ঘৃণার্হ ব্যাপার এবং অশোভন ও সংকটজনক অবস্থা কাটাতে পেরেছিলাম বলেই কিয়ানফু-র স্মৃতি আজও মনে রয়ে গেছে।

দুদিন আমি শহরটি বেড়িয়ে দেখলাম। শহরে কোনরূপ নতুনত্ব এসে দেখা দেয়নি, পুরাতন প্রথা মতেই সকল কাজ চলছে। নতুনের মাঝে এইটুকু মনে হল এখানে একটা ভীষণ কিছু ঘটবে। লোকজন অতি কম কথা বলে, আমোদ প্রমোদের স্থানগুলি একেবারে খালি। যেখানে বসে কথক কথকতা করেন সেখানে লোকজন মোটেই নেই, স্নানাগারে লোক যায় না। ব্যবসা বাণিজ্য অনেকটা মন্দা হয়ে গেছে। সবাই ভাবছে এরপর কি হবে।

বড় বড় চায়ের দোকানে লোক গিয়ে বসে কিন্তু কথা খুব কমই বলে; যা কথা শুনা যায় তা শুধু বয়দের হাঁক ডাক, এর বেশি কিছু নয়। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা উদাস মনে তাঁদের আপিসে যান আর কি করে দিন কাটবে তাই ভাবেন।

এখানে বেশিদিন থাকা নিরাপদ মনে না করে আমরা আবার চালিন-এর দিকেই রওনা হলাম এবং চালিন-এ ফিরে এসে আরও কয়েক দিন বিশ্রাম করবার পর আবার আমি পথে বের হলাম। চালিন হতে বিদায় হবার সময় সাইকেলখানা সংগে নিয়ে আসতে ভুলিনি। সাইকেল উপরের দিকে টেনে নেওয়াটা অবশ্য শক্ত, কিন্তু নীচের দিকে নামিয়ে নেওয়াটা বড়ই বিপজ্জনক। চালিন হতে ফিরে আসবার সময় দুতিনবার পথ হতে পা পিছলে পড়ে যাই। পড়ে যাওয়ার ফলে

দুএকটি স্থানে ক্ষত হয়েছিল তার দাগ এখনও রয়েছে এবং যখনই এই ক্ষতের দাগগুলি চোখে পড়ে তখনই চালিন-এর কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়।

সাইকেলটা রেঁস্তোরায় যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, সেভাবেই পড়ে রয়েছিল, কেউ চুরি করেনি। চুরি করা কারো দরকারও ছিল না। অভাব হলেই লোক চুরি করে, চোর হয়ে কেউ জন্মায় না। সোভিয়েট রাজ্যে কাউকে কাজ করতে না দেওয়াটাই হল সবচেয়ে বড় শাস্তি। হয়তো বলবেন কাজ না করে যদি টাকা পাওয়া যায় তবে আর কেউ কাজ করবে না। এই মত যে কতখানি ভ্রান্ত তা আমরা গবাদি পশুর আচরণ দেখেও বুঝতে পারি। গরু চরে ঘাস খায়, তাদের ঘরে বেঁধে যদি ভাল ঘাসও দেওয়া যায় তবু তারা সে ঘাসে তৃপ্ত হয় না। গরু যেমন মাঠে গিয়ে ঘাস খেতে ভালবাসে মানুষও তেমনি কাজ করতে ভালবাসে। তবে যারা অপরের রক্ত চুষে খেয়ে এতদিন পেট মোটা করে শুয়ে রয়েছে তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন করাতে হবে মাত্র, তার ব্যবস্থাও রয়েছে প্রলিটারিয়েট ডিকটেটরসিপে।

চালিন-এ এসে সাথী দুজনাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজন লোকের সংগে হেনচোফোঁ-তে আসি। হেনচোফোঁ-র কথা 'মরণ বিজয়ী চীন'এ বলা হয়েছে সেজন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা গেল না। হেনচোফোঁ-তে এসে আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। এখানে দারিদ্র্যের ছাপ সর্বত্র বিরাজ করছিল। লোক অবসাদে নিমজ্জিত ছিল। সবাই টাকা টাকা করে অস্থির অথচ অল্প লোকই টাকা পাচ্ছিল। নতুন সমাজে এসে বেখাপ্পা লাগছিল বটে কিন্তু সবই সয়ে গিয়েছিল।

সাদাচীন বনাম লালচীন

কিন্তু কথা হল, এই ক্ষুদ্র সোভিয়েট এতবড় একটা শক্তির বিরুদ্ধে টিঁকে আছে কি করে। চালিন হতে হেনচোফোঁ বেশি দূরে নয়। পথঘাটও এমন কিছু খারাপ নয় যে বড় বড় কামান অথবা সেপাই নিয়ে যাওয়া যায় না। এরোপ্লেনের কথা না বললেও চলে। জেনারেল হো একজন খ্যাতনামা বীর। তিনি বরাবর চাংসাতেই ছিলেন। তাঁর সংগে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে সাহায্যও করেছিলেন। তাঁর ফৌজ অনেক ছিল। অর্থাভাব তাঁর মোটেই ছিল না। তবুও এত ছোট একটি নবজাত সোভিয়েটকে তাঁর ভয় করার কারণ কি তা জানবার সকলেরই ইচ্ছা হয়। আমি তার কারণ কিছুটা বুঝেছিলাম। আমি যে কয়টি কারণ খুঁজে পেয়েছিলাম তা যদি এখানে বলি তবে বোধহয় চালিনের প্রশংসাই হবে।

চীনদেশের সেপাইরা তখনকার দিনে মাত্র দশটি চীনা ডলার মাইনে পেত, তা হতে আবার ছয় ডলার খোরাকী বাবত কেটে রাখা হতো। বাকি থাকত চার ডলার। এর দ্বারা কোন মতেই একজনের হাত খরচও চলত না। দারিদ্র্য ছিল চীনা সেপাইদের চিরসাথী। দারিদ্র্য কেউ পছন্দ করে না। দারিদ্র্য দূর করবার জন্য সকলেই চেষ্টা করে। চীনা সেপাইরাও তখনকার দিনে দারিদ্র্য অপসারণ করার চেষ্টা করত কিন্তু কি করে দারিদ্র্য দূর হয় তাই ছিল জানার বিষয়। লুটের ভাগে সেপাইরা ভাগ বসাতে অধিকারী ছিল না। ভাগ্য ফিরিয়ে আনবার মত লুঠ ছাড়া আর কোন উপায়ও

ছিল না। এটা খুবই সত্য কথা, উত্তেজনার জন্য সেপাইদের মদ খাওয়ান হত কিন্তু সেই মদের তেজ অতি অল্প। তাই নেশা বেশিক্ষণ থাকত না। যখন নেশা ছুটে যেত তখন তারা কি দেখত তা জানি না তবে আমি দেখতাম, সেপাইদের স্ত্রী হাতের বালা বন্ধক দিয়ে চাল কিনে আনছে, জমিদার এসে খাজানার তাগিদ করছে, পাওনাদার এসে পাওনা চাইছে, সুদখোর এসে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ চাইছে, বাড়ি নীলামে উঠছে, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হচ্ছে, রোগে অনেকদিন কষ্ট পেয়ে পুত্রকন্যা অকালে মরছে, ডাক্তারের একবারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এসব সংবাদ নিশ্চয়ই সেপাইরাও পেত। এই সংবাদ শুনে তাদের বুকের পাটা উঁচু থাকত কিনা জানি না তবে শোকে হয়ত তারা একটু আধটু নিশ্চয়ই দমে যেত। এরূপভাবে যারা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কষ্ট পাচ্ছিল তাদেরই আত্মীয়স্বজন ছিল জেনারেল হো-র সেপাই। এরূপ সেপাই নিয়ে সোভিয়েট আক্রমণ করা উচিত হবে কিনা তাই বোধ হয় জেনারেল হো ভাবছিলেন। ভবিষ্যতে কিন্তু তাঁকেই চালিন আক্রমণ করতে হয়েছিল। তখন তার সেপাই-এর সংখ্যা প্রায় চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় আক্রমণ করে সোভিয়েট মতবাদীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমানে সমানে লড়াই হলে নিশ্চয়ই পারতেন না।

চীনা সেপাইরা অন্ধ হয়ে বসে থাকত না। কংসী হতে তারাও বের হয়ে আসছিল সেপাই হবার জন্য। কংসীতে তারা নানাদেশের কথা ত শুনতই উপরন্তু স্থানীয় পলিটিক্স নিয়েও আলোচনা করত। শ্রেণীভেদ সেখানেই জেগেছিল। কংসী হতে বাইরে এসে সেই শ্রেণীভেদটা আরও স্পষ্টভাবে জাগরিত হয়েছিল। তারা স্পষ্টভাবে

বুঝতে পেরেছিল তাদের জীবন বিক্রি হচ্ছে একমুঠা চালের জন্যই। যদি যুদ্ধে তারা মরে তবে তাদের স্ত্রীপুত্রের ভার কেউ নেবে না। তাদের স্ত্রীপুত্র কোথায় কি অবস্থায় থাকবে কেউ তার জন্য মামুলী দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলবে না। তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যা হবে পথের ভিখারী। জীবিত অবস্থাতেই তাদের পরিবারের লোক অনশনে মরছে, তাদের মরণের পরত অনশনে মরবেই। দারুণ অনশন হতে কি করে রক্ষা পাওয়া যায় তার কথা তারাও চিন্তা করত।

একদিন হেনচোফোঁ-র কাছেই একজন আমেরিকান লেকচার দিচ্ছিলেন। তাঁর লেকচার শুনবার জন্য আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি যা বলছিলেন তা বড়ই মুখরোচক ছিল। তাঁর কথা আর একজন লোক চীনা ভাষায় অনুবাদ করে বলছিল। তিনি বলছিলেন—চীনে সোসিয়ালিজম নিশ্চয়ই স্থাপন হবে। সোসিয়ালিজম স্থাপন করার জন্য যুবসমাজ যেভাবে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে অন্য কোন দেশে আজ পর্যন্ত তেমনটি দেয়নি। প্রাণ দেওয়াটা কতদূর ত্যাগ সকলে তা বুঝে না। প্রাণ দেবার আগে যদি আরও দুঃখ কষ্ট পেতে হয় তবে হয় সোনায় সোহাগা। চীনের যুবক যুবতীরা সোসিয়ালিজম স্থাপন করার জন্য নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হচ্ছে। অত্যাচারে তারা মোটেই দমে যাচ্ছে না, একদল লোক যেই দুনিয়ার অন্তরালে চলে গেল অন্যদল তৎক্ষণাৎ তাদেরই কাজ নতুন তেজে করতে শুরু করল। বড় বড় রথী এবং মহারথী এসব বিপ্লবীদের দাবিয়ে রাখবার যতই চেষ্টা করছেন, কৌশল জাল বিস্তার করছেন, তাদের তেজ, তাদের নিষ্ঠা, তাদের ত্যাগ ততই দুর্দমনীয় হয়ে উঠছে। এরপরও কি আপনারা বলতে চান চীনে সোভিয়েট হবে না? চারিদিক হতে বজ্রমুষ্টি উর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হল সেই কথার

শেষ ভাগে। আমি বুঝলাম এখানে শুধু মুখের কথা হচ্ছে না, বাচালতা হচ্ছে না, হচ্ছে প্রাণের বেদনার ঝংকার আর সেই ঝংকারে কেঁপে উঠছে সাম্রাজ্যবাদীর প্রাণ। তারপর তিনি বলছিলেন যদি এই সংগ্রামে চীন বাঁচে তবে পৃথিবীর সেরা দেশ আমেরিকাও বাঁচবে।

তখন বুঝিনি আমেরিকা কি করে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল দেশ হল। এখন আমেরিকা দেখে অনুভব হয়েছে পরিষ্কার পথঘাট, বাড়ীঘর, ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা, গ্যাসের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আমেরিকা পৃথিবীর অন্যসব দেশ হতে সত্যই এগিয়ে গেছে। আমেরিকানরা সোসিয়ালিস্ট হলে নিশ্চয়ই চীনের সোসিয়ালিস্টদের মতই মতবাদ গ্রহণ করবে। চীনের সেসিয়ালিস্টরা অপরের দেশ কখনও করায়ত্ত করতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে চীনের সোসিয়ালিস্টরা নিজের দেশকে অপরের হাতে ছেড়েও দেবে না।

চীনা সোসিয়ালিস্টদের সংগে কথা বলে, তাদের সংগে থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছে, সেই ধারণাটি হল—চীনের সোসিয়ালিস্টরা বড়ই উদার। তারা চায় পৃথিবীর নিপীড়িত জাতের মুক্তি। এতে তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যাদের এতবড় উচ্চ উদার আদর্শ তাদের জয় কামনা সকলেই করবে। আমি পূর্বেও করতাম এখনও করি, বলি বিদ্রোহী চীন জয়লাভ করুক।

ন্যাশানালিজম ছোট। ছোট হতেই বড়র উৎপত্তি। ন্যাশানালিস্ট চীন এত উদার মতবাদ পোষণ করে না কারণ ন্যাশানালিজম ছোট। ছোট মতবাদ নিয়ে বড় কথা অনেকেই বলে, ন্যাশানালিস্ট চীন তা হতে বাদ পড়েনি। তখনকার দিনের ন্যাশানালিস্ট ডাঃ ওয়েলিংটন কু-এর সংগে আজকের ডাঃ ওয়েলিংটন কু-এর কোন সম্বন্ধ নেই।

তখন তিনি ছিলেন কতকগুলি লোকের মুখপাত্র, আজ তিনি চীনের মুখপাত্র। তখনকার দিনে যখন চীনের কথা একটি বৈদেশিক কমিশনের কাছে বলতে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময়েই আমি তাঁর দর্শন প্রার্থী হয়েছিলাম। ন্যাশানালিস্ট হলেই লোকের মনও ছোট থাকে, তাই দেবতা আমায় দর্শন দেননি।

পিকিন পার হয়ে আমি যখন মুকদেনের কাছাকাছি হয়েছি, তখন একদিন সংবাদ পেলাম একটি বৈদেশিক কমিশন আসছে মানচুরিয়ায় এবং তারই সংগে আসছেন ডাঃ কু চীনের দাবী পরদেশী পঞ্চায়েতের কাছে পেশ করবার জন্য। কয়েকদিন পর আবার শুনলাম মুকদেনের এক ক্লাবে বসে যখন ডাঃ কু চা খাচ্ছিলেন তখন তাঁর হঠাৎ জাপানাতংক রোগ এসে দেখা দেয় এবং তিনি চা পরিত্যাগ করে লর্ড লিটনের শরণাপন্ন হন। লর্ড লিটন হেসে ডাঃ কু-কে কি বলেছিলেন তিনিই জানেন, তবে তা নিয়ে জাপানী সংবাদপত্র এবং কমিউনিস্ট দলের লোক বেশ হেসেছিল।

হাসবার বিষয়ও হয়েছিল। কমিউনিস্টরা নূতন চীন, লাল চীন গড়তে চায় আর ডাঃ কু জাপানাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে চায়ের পেয়ালা ফেলে পলায়ন করেন, এতে হাসবার কথা ছাড়া আর কি আছে? ডাঃ কু চুংপরিবারের অন্ধের যষ্টি ছিলেন। একদিকে বৈদেশিক ডিপ্লমেটদের ধমকানি, অন্যদিকে জাপানী এবং লাল চীনা ফৌজের রক্তচক্ষু অনবরত চুং পরিবার এবং তার সংশ্লিষ্ট সকলকেই আধমরা করে ফেলেছিল। যারা তা দেখেছে তারাই ব্যাপারখানা কি বুঝতে পেরেছে। যারা দেখেনি তারা দূর থেকে চুং পরিবারকে বাহবাই দিয়েছে। আমি এদের কর্মপদ্ধতি এবং জীবনযাত্রা দেখেছি বলেই বাহবা দিতে সক্ষম হইনি।

বাস্তবিকই চীন আজব দেশ। চীনের পুরাতন সময় হতে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনা চীনের লোকের কাছে যেমন অজ্ঞাত, পরদেশী লোকের কাছেও তেমনি অজ্ঞাত। অনেকে সেই অজ্ঞাত বিষয়কে উপলক্ষ্য করে নানারূপ গল্পের অবতারণা করেন বটে কিন্তু কূলকিনারা করতে পারেননি। যাঁরা কূটনীতিতে বিশারদ তারাও চীনের বিষয় নিয়ে হাঁপিয়ে পড়েন।

মানচিত্র সামনে রেখে কর্মচ্যুত-হবার-ভয়ে-ভীত কন্‌সালদের রিপোর্ট পাঠ করে, দাবায় চাল দেওয়া যদি হয়ে উঠত তবে আর এতগুলি সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস পাঠ করে মগজ শুকাবার কোন কারণই ছিল না। বেতনভোগী সংবাদপত্রসেবীর দল অসত্য সংবাদের উপর রং চড়িয়ে প্রভুদের মনস্তুষ্টি করতে কসুর করে না কারণ তাদের উদ্দেশ্যই হল টাকা পাওয়া। একদিকে টাকার লোভ, অন্যদিকে টাকার বিনিময়ে দাসত্ব—এই যে দুটো অবস্থা, তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং তারই ফলে যে কর্ম হয় সেই কর্মের মূল্য মোটেই নেই। সেই কর্মের যে মূল্য নেই সকল সময় তা চোখে দেখা যায় না। হাঁ, সেই পুরাতন পদ্ধতি বেমালুম চলে যেত যদি সোসিয়ালিজম্‌এর জন্ম না হত। সোসিয়ালিজম্‌ চীনদেশে আঁধারের আলো। এই আলো যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই অন্ধকার অপসারিত হচ্ছিল। চীনের চিয়াং কাই-শেক সোসিয়ালিজম্‌ জেনেছিলেন বহুপূর্বে। ডাক্তার সুন্‌-ইয়াৎ-সেন তাঁর 'ত্রি-নীতি'তে ভাল করেই তা বুঝিয়েছেন, কিন্তু তা হলে কি হয়, স্বার্থের মোহ বড় ভয়ানক। তিনি সকল প্রগতিকে ভুলে গিয়ে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মত গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছিলেন, আর নানারূপ মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট-ভয়ে থর থর করে কাঁপতেন। সেই আতংকের ফলে অনেক গর্হিত কাজও

করতে হয়েছিল। ফল কিন্তু বড় ভাল হল না। যাদেরেই তিনি সন্তুষ্ট করতে চাইছিলেন তারাই তাঁর ঘাড়ে চেপে বসছিল। চিয়াং কাই-শেক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, এদিকে কমিউনিস্ট পার্টিকেও সাহায্য করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। এতে সুং পরিবারের স্বার্থ বজায় থাকতে পারত না। অপর দিকে বৈদেশিকরা হয়ত তাঁর গদিচ্যুতির ব্যবস্থা করত। বাস্তবিকই তখনকার অবস্থা বড়ই সংগীন ছিল। চিয়াং কাই-শেকের বৈদেশিক মন্ত্রীরা তখন কি মন্ত্রণা দিতেন সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না. কিন্তু বৈদেশিক চীনাদের মধ্যে যাঁরা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন তাঁদের মতামত কিন্তু অন্যরকমই ছিল।

আমি তখন ছিলাম সিংগাপুরে। অবসর মত লাইব্রেরীগুলিতে প্রায়ই যাওয়া আসা করতাম। একদিন দেখতে পেলাম একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একখানা চীনা বইএর পাতা উল্টাচ্ছেন। সেই বইখানাতে শব্দগুলি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা ছিল। বইখানার দিকে বার বার তাকাতেই চীনা ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন এই বইখানা চলতি শব্দে লেখা হয়েছে। এই বইখানা মেন্‌ডেরিন ভাষায় লিখিত। কথাপ্রসংগে ভদ্রলোকের সংগে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমি তাঁকে আমার বাসস্থানে আসতে নিমন্ত্রণ করি। তিনি আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

পিকিন হতে নানকিনে রাষ্ট্রকেন্দ্র পরিবর্তনের কথা তখনকার দিনে সবাই বলা কওয়া করত। সাধারণ লোক জেনারেল চিয়াং কাই-শেককে এ বিষয়ে প্রশংসাই করত। কিন্তু এই ভদ্রলোক বিপরীত মন্তব্য করলেন। চীনারা কোন বিষয়ে সহজে মন্তব্য করে না। মন্তব্য করার হিসাবে চীনারা বৃটিশের মতই পুরাতন মতবাদী। এই ভদ্রলোক

আমাকে বলেছিলেন রাষ্ট্রকেন্দ্র বদলাবার নানা কারণ রয়েছে, সাধারণ লোক বুঝেছে মানচু লর্ডদের আক্রমণ হতে রাষ্ট্রকেন্দ্র দূরে সরিয়ে আনা দরকার, আসলে সেরূপ দরকার কিছুই হয়নি। বৈদেশিকগণ জাপানকে মানচুরিয়া তুলে দিতে চান, রুশের প্রভাব হতে এশিয়া দেশকে দূরে রাখবার জন্য। মানচুরিয়াতে রুশ প্রভাব এরই মধ্যে বেশ প্রসারিত হয়েছে, হয়ত কালে মানচুরিয়া লাল হয়ে গিয়ে সমুদয় চীনকে লাল করে বসবে এই ছিল তাদের ভয়। উত্তর চীনে এবং দক্ষিণ চীনে যদি সোভিয়েটপ্রথা প্রচলিত হয় তবে মধ্যভাগটা আপনি সোভিয়েট হয়ে যাবে। উত্তর চীনে মা-চান্দ-সান ক্রমেই রুশ-মতবাদী হয়ে উঠছেন আর দক্ষিণে মাও-সুতন সোভিয়েট স্থাপন করেছেন। তখনকার দিনে এসব কথা বাজে কথা বলেই মনে হত, এবং এতবড় চিন্তাধারাও মগজে ঢুকত না। কিন্তু যখন চীনদেশে গেলাম তখন বুঝতে পারলাম সিংগাপুরের ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

চিয়াং কাই-শেক তখন হয়ত বুঝতেই পারেননি বৈদেশিক মন্ত্রিগণ, বিশেষ করে জাপানী মন্ত্রী কেন তাঁকে রাষ্ট্রকেন্দ্র মানচুরিয়ার কাছ হতে সরিয়ে আনতে এত অনুরোধ করছেন। নানকিনে যখন রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হল তখন জাপান হতে আসলেন এক জাপানী ভদ্রলোক। তিনি পরিচয় দিলেন যে ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং ডাক্তারের কথা স্মরণ করে তিনি দু'এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে ভুলেননি। প্রহসন ভালয় ভালয়ই সমাপ্ত হল। দূর হতে সভ্য সাম্রাজ্যবাদীরা হাসলেন। তারপরই যেন একটা অশান্তির প্রবল ঝঞ্ঝা উত্তর-চীনের বুকের ওপর দিয়ে বইবে বলে মনে হল। সর্বসাধারণ যা ধারণা করল ঠিক তাই হল। মানচুরিয়া জাপানীরা অতর্কিতে আক্রমণ করল এবং নিহত মার্শাল চেং সো-লিং-এর জয়ানো

স্বর্ণ সমেত মুগদেন নগর দখল করল। জাপানীরা পেল অগণিত স্বর্ণ মুদ্রা আর পেল মানচুরিয়া। সভ্য সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবল এবার আর রুশরা এশিয়াতে তাদের মত থাবা বাড়াবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সভ্য হলে কি হয়, তাদের মন অতি ছোট, দৃষ্টি থাকে নিকটে। তারা বুঝল না বনের বাঘকে মানুষের রক্ত খেতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, একদিন হয়ত তাদেরই রক্ত চুষে খাবে। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় লেকচারে আমি বলেছিলাম—জাপানকে মানচুরিয়া ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা হয়ত্রো ভাবছেন তাঁরা নিরাপদ হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা আপদকে আরও কাছে ডেকে নিয়ে এসেছেন। মানচুরিয়ার লোহা, কয়লা, এবং সোয়াবীন তখনকার দিনের জাপানের পক্ষে ছিল প্রাণবায়ুর সমান। তারপর আবার হয়ত ভারতের গম এবং লোকবলের ওপর জাপানীদের দৃষ্টি পতিত হবে। রুশ জাপানকে সেরূপ শক্তিশালী হতে দেবে কিনা সন্দেহ। ভারতের লোকবল, বার্মার চাল, মালয়ের টিন যার হাতে যাবে সে পৃথিবীকে উৎখাত করে ছাড়বে।

জেনারেল চিয়াং কাই-শেক মানচুরিয়া হারিয়ে মানচুরিয়া ফিরে পাবার চেষ্টা ত করলেনই না, উপরন্তু যারা মানচুরিয়া ফিরে পাবার উদ্যোগ করছিল তাদের প্রতি রেগে গেলেন। পিকিনে চাং হুয়া-লিয়াং-এর পক্ষে বাস করা কষ্টকর হয়ে উঠল। কতকগুলি ভুঁইফোঁড় সংবাদপত্র চাং হুয়া-লিয়াং-এর নামে ন্যানারূপ বদনাম রটাতে লাগল। যারা একটিও জাপানীদ্রোহী কথা বলছিল তাদেরই কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে জাপানী মতে পৃথিবীর খাতা হতে তাদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছিল। দক্ষিণ চীনে কি করে কমিউনিস্ট দমন করা যায় তার ফন্দি আঁটা হচ্ছিল।

এদিকে জাপানীরা মানচুরিয়ার নাম বদলে মানচুকো করল। চীনারা ভাবল নাম পরিবর্তনে কি আর আসে যায়। কিন্তু যেদিন মানচুরিয়া

মানচুকো হল সেদিনই দেখা গেল মানচুরিয়া Three Eastern Provinces হতে Five Eastern Provincesএ পরিণত হয়েছে। জেহোল এবং চাহার নামক দুটি প্রদেশ জাপানীরা মানচুরিয়ার সীমানার মধ্যে এনেছিল। যাদের শক্তি বেশি এবং বর্বর তারা কখনও তর্ক মানে না, তারা যা চায় তাই আদায় করে নেয়। জাপানীরাও কোন ন্যায়সংগত যুক্তির ধার ধারলনা, চাহার এবং জেহোলের কতক দখল করে নিল। চাহার এবং জেহোল জাপানীরা দখল করে নেবার পর চীনাদের পূর্ণজ্ঞান ফিরে এল। ছোটমনা ন্যাশানালিস্টরা কমিউনিস্টদের ঘৃণা করা বন্ধ করে ন্যাশানালিস্ট এবং কমিউনিস্ট উভয়ে মিলে জাপানকে এবং জাপানীদের সাহায্যকারীদের সায়েস্তা করার পথ খুঁজতে লাগল। ন্যাশানালিস্ট দলেও ভাংগন ধরল।

এদিকে চুং পরিবারের নেতা অপরের হাতের পুতুল হয়ে নাচতে লাগলেন। তিনি শুধু কমিউনিস্ট ভয়েই কাঁপছিলেন এবং কি করে কমিউনিস্টদের সবংশে নিধন করতে পারবেন তারই চেষ্টা করছিলেন। জাপানীরা যে চীনকে উৎখাত করছে সে দিকে তিনি মোটেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। সেজন্য জেনারেল চিয়াং কাই-শেককে এখন আর দায়ী করে লাভ নেই, কারণ তিনি মত বদলেছেন, কমিউনিস্টদের আপন করে নিয়েছেন। আজ কমিউনিস্ট এবং ন্যাশানালিস্ট একযোগে কাজ করছে জাপানীদের তাড়াবার জন্য। চীন জয়ী হবে এটা সুনিশ্চিত। মানুষের মতিগতি কখন যে কিরূপ হয় তার নিশ্চয়তা নেই। আজ চিয়াং কাই-শেক বিশ্বপ্রেমে মত্ত, সেই চিয়াং কাই-শেকের পূর্ব জীবন একটু আধটু আলোচনা করা অন্যায় হবে না বলেই এখানে মোটামুটি কিছুটা বলা হল। এতে আমরা বুঝতে সক্ষম হব কমিউনিস্টদের কতটা বিপদ-আপদ বরণ করে নিতে হয়েছিল।

কেনাডা হতে ফিরে এসে আমি একমাস সাংহাই-এ ছিলাম সেই একমাস চীনের রাষ্ট্রনীতির চাকা কোন দিকে ঘুরছিল তারই দিকে লক্ষ্য রেখে সময় কাটাচ্ছিলাম। কোনরূপ সভা-সমিতিতে মোটেই যোগ দিতাম না, শুধু চীনের ভেতর হতে সদ্য প্রত্যাগত প্রগতিশীল কর্মীদের সংগেই যা কিছু সম্পর্ক রাখতাম। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে ফ্রেন্চ কনসেসনেই এসব লোকের আড্ডা ছিল। আড্ডাতে যাঁরা আসতেন তাঁরা ছিলেন কর্মী। কর্মীরা অনেক সময় খাবারের অভাবে এবং উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে আসতে বাধ্য হতেন বিশ্রাম নেবার জন্য। তাঁরা প্রায়ই কথা কম বলতেন। যেসকল কথা বলতেন তা মার্জিত এবং সজীবতাপূর্ণ। কথাপ্রসংগে একদিন এক যুবক বলেছিলেন—আমাদের কমরেডরা ঘাতককেও হার মানিয়েছে। চাংসাতে কতকগুলি কমরেডের গর্দান নেবার আদেশ হয়। কমরেডরা ঘাড় নত করে মাটিতে বসেছিলেন আঘাতের অপেক্ষায়। ঘাতক এক একটি আঘাত করবে আর ঘাড় হতে মাথা পৃথক হয়ে মাটিতে পড়বে। ঘাতক সেদিন বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার হাত কেঁপে উঠছিল। ঘাতকের হাত কাঁপতে দেখে কয়েকজন কমরেড হিস্ হিস্ করে জানিয়ে দিলেন সে অকর্মণ্য, অন্য ঘাতককে আনা হউক। কর্তৃপক্ষ কমরেডদের নিবেদনে কান দিলেন না। ঘাতক যখন প্রথম লোকটির ঘাড়ে আঘাত করল, দেখা গেল প্রথম কমরেডের মাথা ঘাড় হতে একদম পৃথক হয়ে যায়নি। ফের তাঁরা হিস্ হিস্ করে উঠলেন। ঘাতক লজ্জায় মাথা নত করে প্রথম কমরেডের মাথাটি কোন মতে শরীর হতে পৃথক করে চলে যেতে বাধ্য হল। চীনদেশে একটা নিয়ম আছে, যদি এক আঘাতে ঘাড় হতে মাথা পৃথক করতে পারা না যায় তবে সেদিনের মত হত্যাকাণ্ড বন্ধ

রাখতে হয়। কমরেডরা সেদিনের মত বাঁচলেন। আমরা বাইরে থেকে তাঁদের পালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলাম না। দ্বিতীয় দিন ঘাতক বেশ সুস্থ শরীরেই বধ্যভূমিতে এল। সেদিন সে তিনজন কমরেডের গর্দান নেবার পর যখন চতুর্থ কমরেডের কাছে গেল তখন দেখল চতুর্থ কমরেড তার আত্মীয়। আত্মীয়ের মুখ দেখে ঘাতকের মুখ শুকিয়ে গেল। ঘাতক আত্মীয়ের ঘাড়ে আঘাত করেছিল, কিন্তু শরীর হতে মাথা পৃথক হয়নি। ঘাতক দারুণ চীৎকার করে বধ্যভূমি হতে চলে গেল। আমাদের কর্মতৎপরতা পূর্বেও বেশ ছিল, নতুন সংবাদ পেয়ে আমরা পুরাদমে কাজ করে হতাবশিষ্ট কমরেডদের জেল হতে বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই বলেই সত্তপ্রত্যাগত কর্মী চেয়ারের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমি তাঁর ক্লান্ত শরীরের দিকে চেয়ে রয়েছিলাম এবং ভাবছিলাম ক্রমাগত কত পরিশ্রম করলে শরীরে এরূপ অবসাদ আসতে পারে।

চীনা জাতকে এবং চীন দেশকে তখনকার দিনে নিজের দেশের মতই ভালবাসতাম। চীনারা যাতে বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীন বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে তা শুধু কামনা করতাম না, নিজেও মাথা খাটিয়ে দেখতাম এঁদের কোনমতে সাহায্য করতে পারি কি না। কিন্তু আমি যে সকল উপায় নির্ধারণ করতাম তা বালসুলভ চপলতা মাত্রই ছিল। অনেকে আমার কথা শুনে হাসত। তারা বলত আপনি জেনে যান আমরা কত রকমে উৎপীড়িত হচ্ছি এবং সময় দেশ বিদেশের লোকের কাছে তা বলতে ভুলবেন না। এ যে অত্যাচার কাহিনী আমি শুনতাম তা আমার ভারতীয় বন্ধুদের কাছে মোটেই বলতাম না। তারা চীনদেশে থেকে, চীনা ভাষা [illegible] করে



শুধু বুঝতে পেরেছিলেন চীনারা অমানুষ, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা চীনদেশ দখল করে নেবেই, চীনদেশে এমন বীর জন্মায়নি যে চীনদেশকে অপরের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে চীনাদের শক্তির কথা বলতাম, কিন্তু তাঁরা সংবাদপত্রের সংবাদ শুনেই সন্তুষ্ট থাকতেন, চীনাদের সংগে কথা বলাটাও অপমান বলেই বোধ করতেন। তাঁরা জানতেন না তাঁদের বাড়িতেই যে সকল লোক বয় বাবুর্চির কাজ করে তারা প্রত্যেকেই সহস্র গুণে তাঁদের চেয়ে গুণী। সাংহাই-এর ভারতীয় ব্যবসায়ী ভাইরা এবং জনকয়েক কেরানী ইউরোপীয় এবং জাপানীদের সংগেই মিশতে ভালবাসতেন। চীনারা শুধু চুরি করতে জানে এই ছিল তাঁদের ধারণা। এরূপ মনোবৃত্তি নিয়ে যে সকল ভারতবাসী সাংহাই-এ থাকতেন তাঁদের মুখ হতে তাঁদের অজ্ঞাতেই চীনাদের সম্বন্ধে অনেক ভাল কথাও বের হয়ে যেত যাতে তাঁরা মোটেই গুরুত্ব দিতেন না। অর্থ-অন্বেষী ভারতীয় বণিকরা চীনাদের প্রতি কোন দরদ না দেখালেও, তাদের চীনা দাস-দাসীর সাহায্যে অনেক সময় চীনা বিপ্লবীরা সাহায্য পেয়ে যেত। এখানে এরূপ একটি ঘটনা বলছি। তাঁরা কখনও ভাবতেন না কত রকমে মানুষের সাহায্য করা যায়। তারা ছিলেন সাত্ত্বিক ধরণের ব্যবসায়ী, টাকা রোজগারই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাদের ঘরে যে সকল চাকর চাকরাণী কাজ করত তাদের চাতুর্য কখনও বুঝতে চাইতেন না।

জাপানী সেপাইদের দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনটি চীনা যুবক এক ভারতীয় শিখ ব্যবসায়ীর ঘরে আশ্রয় নেয়। বাড়িতে তখন কেউ ছিলেন না, শুধু চীনা চাকরানী এবং তার স্বামী ঘরে বসে কাজ করছিল। এমনি সময় হঠাৎ তাদের দ্বারে করাঘাত হল, তখন তারা

দরজা খুলে যুবকদের দেখতে পেয়েই ঘরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিল। নিমেষের মধ্যে কি কথা হল তারপরই তিনটি চীনা যুবক ঘরের মধ্যে একেবারে লোপ হয়ে গেল। জাপানীরা এসে খুঁজে দেখল ঘরে কেউ নেই। তিনটি চীনা যুবক কি করে উধাও হয়েছিল তার সংবাদ ক্লাবে গিয়ে যা শুনেছিলাম তা এক রকম এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী যা বলেছিলেন তা অন্য রকমের। চীনা যুবকদের তাঁরই ঘরে আত্মগোপন করতে দেওয়াটা বড়ই অন্যায় হয়েছে বলে ভারতীয় ব্যবসায়ীটি ভেবে ত ছিলেনই উপরন্তু ভেবেছিলেন যদি জাপানীরা সন্দেহ করে যে এই আত্মগোপনে তাঁর সহায়তা অথবা সম্মতি ছিল তবেই হবে ফ্যাসাদ। এরূপ বিপদে পড়ে তিনি স্থানীয় বড় বড় ভারতীয়দের সংগে পরামর্শ আরম্ভ করেছিলেন এবং 'জয় শ্রীগোপালজী' বলে নিজের মনে শান্তি আনতে চেষ্টা করছিলেন। শুভানুধ্যায়ী ব্যবসায়ীরা তাঁকে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগলেন এবং বুঝাতে লাগলেন এতে ভবিষ্যতে তাঁর কোনও খারাপ হবার কারণ নেই। কিন্তু উপদেশে তাঁর মনে শান্তি আসছিল না। আমি অবস্থা দেখে ভাবছিলাম হয়ত ভদ্রলোক কেঁদে ফেলবেন এবং জাপানী কন্সালের পায়ে ধরে জানাবেন এতে তাঁর কোনরূপ সম্মতি ছিল না। সেদিনই চীনা দম্পতীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং কেন তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে সাংহাই পুলিশকে জানানও হয়েছিল। আমার হয়ে তাঁকে একটা বণ্ডে সই করার কথা ছিল, এই ঘটনার পর আমার জন্য বণ্ডে তাঁর দস্তখত করা আর হয়নি।

চীনাদের আড্ডায় গিয়ে শুনেছিলাম, উক্ত সিন্ধ ব্যবসায়ী বাড়িতে পৌছবার পর, চাকরাণীর সাহায্যে পলাতক চীনা যুবক তিনটি অন্য বাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং সেই বাড়ীর চাকরাণীও

যুবকদের সাহায্য করেন। জাপানীরা চলে যাবার পর সদর দরজা দিয়েই এক এক করে তিনজন তিন দিকে চলে যায়। উভয় বাড়ীর চাকরাণীরা কমিউনিস্ট পার্টির গণ্যমান্য সভ্য ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সভ্যরা কি করে চাকর চাকরাণীর কাজ করে দিন কাটান এ সংবাদ আমার কাছে নতুন নয়। এরূপ ঘটনা কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে এই সর্বপ্রথম ঘটেছিল। অবশ্য ভারতীয় বণিকগণ কখনও ধারণা করতে পারেননি যে এরূপ নিকৃষ্ট কাজ করেও দেশসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা যায়।

কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে কোন সভা হতে দেখিনি যদি বলি তবে অনেকেই হয়ত হাসবেন। কমিউনিস্টরা তাঁদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করেই যেন থাকতে চান এটা হয়েছিল আমার ধারণা। বড় বড় সভা তাঁদের মধ্যে হতো তা অতি গোপনে। এমনি করে তাঁরা বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবের কথা মুখে বলা বড়ই সহজ এবং নিজকে বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করাও সহজ কারণ জনসমাজ চায় অনবরত পরিবর্তন। কিন্তু বিপ্লব যখন আসে তখনই বুঝতে পারা যায় কে প্রকৃত বিপ্লবী আর কে বিপ্লবী নয়। চীনে চলছিল বিপ্লব অতএব বিপ্লবীদের পরিচয় পেতে মোটেই কষ্ট পেতে হতো না। ঘাড়ের উপর খাঁড়া ঝুলিয়ে যারা বুক ফুলিয়ে পথে হাঁটে তারাই প্রকৃত কর্মী। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ের ওপর তখন খাঁড়া ঝুলছিল।

চীনদেশের মজুর নানা রকমের। আমরা যদি ওদের দুভাগে বিভক্ত করি তবে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথম ভাগে হল কৃষক-মজুর আর দ্বিতীয় ভাগে হল ফ্যাক্টরী-মজুর। যারা ছোটখাট কল-কজার দোকানে কাজ করে তারাও মজুর—যেমন কেউ সাইকেল সারাবার দোকানে কাজ করে, কেউ কামারের দোকানে কাজ করে।

এসব এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্ত মজুরদের সজাগ করা সহজ কথা নয়। কৃষক-মজুর ত আরও এলোমেলো। কারো হয়ত দুজন মজুর আর কারো হয়ত পাঁচজন মজুর জমিতে কাজ করে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের সজাগ করা কি সহজ ব্যাপার! কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট দলের পক্ষে এসব কাজ সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কখনও লেকচার দিয়ে বুঝাত না, মজুরের সংগে থেকে মজুরী করার সময় কানে কানে যা বলত তাই হতো সহস্র লেকচারের চেয়েও বেশি ফলপ্রদ। মজুরের সংগে না থাকলে মজুরের কষ্ট যেমন বুঝা যায় না, মজুরকে বুঝানও তেমনি কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে গ্যাশনালিস্ট সরকারও চুপ করে বসেছিলেন না। তাঁরাও প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন যাতে করে মজুর মজুরই থাকে, সেয়ানা মজুর না হয়। সেজন্য তাঁরা বড় বড় কেন্দ্রে নিজেদের লোক পাঠান যাতে করে মজুরদের মধ্যে সেয়ানা বুদ্ধি না জাগে তার চেষ্টা করতে। তাঁদের চেষ্টা ছিল দু রকমের। প্রথমত 'কুপথগামী' মজুরকে বুঝিয়ে সুপথে আনা। তাতেও যদি মজুরের সুবুদ্ধি না হয় তবে বলপ্রয়োগ করা হয়—হয় মজুর যমের বাড়ী যাবে, নয় 'কুপথ' পরিত্যাগ করে তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে। এর ফলে কমিউনিস্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল উভয় দলের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল বেশ সুন্দর রকমেই। একদল নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কাজ করছিল, অপর দল অপরের প্রাণ নিয়ে নিজেদের শক্তি কায়েম রাখতে চেষ্টা করছিল। দুই বিরোধী দলের সংঘাতে চীনের ভাগ্য যেরূপ ভাবে দোল খাচ্ছিল তার গতির সঠিক পরিমাণ আমরা বাইরের লোক ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারব না। কিন্তু চীনের জনসাধারণ জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করে এই মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। তাই আজ মরণমুখী চীন মরণবিজয়ী হয়ে

কথাটা যেন একটু ঐতিহাসিক হয়ে গেল। স্থানীয় সংবাদপত্র বিষয়টাকে ঐতিহাসিক ভাবেই রেখে দিতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার সংবাদপত্র বিষয়টাকে রং চড়িয়ে একটা হাসির বিষয়ে পরিণত করতে বেশ চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে হলিউডে তুখানা ছবিও তোলা হয়েছিল, তাতে কমিউনিষ্ট চীনকে ডাকাত আর ন্যাশানালিষ্ট চীনকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছিল। পৃথিবীর যত ধর্ম আছে সকল ধর্মের যাজকদের একত্রিত করে কিরূপে ডাকাতদের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপদেশ চাওয়া হয়েছিল। এতে হিন্দুধর্ম ছাড়া সকল ধর্মের মিশনারীরাই যোগ দিয়েছিলেন। তবে চব্বিশ পরগণার মিঃ সাঁতরা যোগ দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনের কয়েকখানা আমেরিকার সংবাদপত্র বেশ করেই হাটে হাঁড়ি ভাঙছিল। সেই সংবাদপত্রগুলি ছিল মজুরদের দ্বারা পরিচালিত। তাতে বিজ্ঞাপন থাকত না, শুধু মজুরদের কথাই থাকত। এ ছাড়া পৃথিবীর অপর সকল সংবাদপত্রই চীনের ডাকাতদের সম্বন্ধে সত্য কথা প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। তাঁরা এই ধর্মসভার কর্মতালিকাও প্রকাশ করেননি। কত আশ্চর্যের বিষয় এ তুনিয়াতে দৈনিক ঘটছে অথচ দৈনিক সংবাদপত্র-গুলি এ বিষয়ে একেবারে নীরব।

পৃথিবীর লোকের মৌখিক সহানুভূতির দিকে চীনের বীরের দল তাকায়ও নি। তারা জানতেন "আত্মবলাম্বিত মাঙ্গ বলং"। নিজের বলই বড় বল। যদি নিজের মধ্যে শক্তি না থাকে তবে বড় বড় কথার মূল্য নেই। তাঁরা একদিকে নিজের শক্তি অর্জন করতে লাগলেন আর অন্যদিকে মৃত্যু বরণ করে মরণকে জয় করতে লাগলেন।

প্রগতিশীল চীন

ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চুং পরিবার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অনুকরণে চীনের কর্ণধার হয়ে বসলেন। প্রগতিশীল চীনারা তা মোটেই পছন্দ করত না অথচ এই ভূতকে ঘাড় হতে নামাবার পথও খুঁজে পেত না। জাপানের ঘাড়েও চীনের মতই কতগুলি পরিবার বসে রয়েছিল, এখনও তারা বসেই আছে। চীনারা তা জানত। জাপানকে অনুকরণ করাটা চীনারা মোটেই পছন্দ করত না এবং এখনও করে না। চীনাদের মধ্যে অনেকে হয়ত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের ইতিহাস জানত না, তাই বুঝতে পারত না যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপই হল তাই। ন্যাশানালিজম সকল সময়েই কতকগুলি লোকের বোঝা ঘাড়ে করে চলতে বাধ্য হয়। যে সকল জ্ঞানী এসব কথা জানেন তাঁরা কখনও ন্যাশানালিজম পছন্দ করেন না, তাঁরা সোসিয়ালিজমই গড়ে তুলতে প্রাণ পর্যন্ত দান করতে উৎসাহী হন। সেজন্যই চীনের প্রগতিশীলরা চুং পরিবারের ডিক্টেটরী প্রথা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং এই ডিক্টেটরী প্রথাকে আমূল উৎপাটন করে চীন সাগরে বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। চুং পরিবার নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য চীনের প্রগতিশীলদের নানা নামে আখ্যাত করতেন। শেষটায় দেখা গেল এরূপ বাজে নামের কোন মূল্য নেই। এমন একটা নাম দেওয়া চাই যাতে করে পৃথিবীর সকল প্রতিক্রিয়াশীল-দের সাহায্য পাওয়া যায়, তাই এই উদীয়মান প্রগতিশীলদের নতুন নাম হল কমিউনিস্ট। যে মুহূর্তে প্রগতিশীলদের এই নামকরণ হল সেই মুহূর্ত হতে পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদীর দল একত্র হয়ে কমিউনিস্ট দলনে

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সময়ের প্রভাবে অর্থাৎ লোক জাগরণের ফলে পৃথিবীর অবস্থা বদলে যেতে লাগল। প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখলেন যদি জাপানকে দমন করতে হয় তবে গালভরা কথার দ্বারা কিছুই হবে না, জাপান গালসুদ্ধ গলা কেটে ফেলবে। কিন্তু উপায় কি? যদিও কমিউনিস্টদের সংগে একটা রফা হয়েছে তবুও তাদের সংগে আন্তরিকতা হয়নি। কমিউনিজম আর ন্যাশানালিজমে কখনও মিল-মিশ হতেই পারে না। এদিকে জাপানীরাও হুহু করে ঘাড়ে পড়ছে। তখন নিরুপায়ের উপায় কমিউনিস্ট নেতাদের ডাকা হল, তাদের চতুর্থ রুট ইন্‌ফেন্ট্রির কাজকর্ম মেনে নেওয়া হল। এই মিলনের সংবাদ তুরকমে বের হয়েছিল। চীনা সংবাদপত্রের সম্পাদকরা বলেছিলেন এতে ভালই হল আর বৈদেশিক সংবাদপত্রের সম্পাদকরা বলেছিলেন, যখন কাজ সারা হয়ে যাবে তখন কমিউনিস্ট পার্টির আবার নিপাতের ব্যবস্থা হবে। কাজ ফুরলে পাজী—এই পরিকল্পনাই জেনারেল চিয়াং কাই-শেক গ্রহণ করবেন। কিন্তু ফলে যা হবে তা উপসংহারে না বলে এখনই বলছি—চীন "সব লাল হো যায়গা", কেউ এবিষয়ে বাদ সাধতে পারবে না রুখেও দাঁড়াতে পারবে না।

পুঁজিবাদী চীন সরকার কমিউনিস্টদের ডেকে পাঠাবার পূর্বে খুবই চেষ্টা করে দেখেছেন জাপানকে একাই রুখতে পারেন কিনা, কিন্তু যতবারই জাপানকে একা রুখতে গেছেন ততবারই পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। জাপানকে দুর্বল ভাবা নেহাৎই মূর্খতা। কিন্তু জাপানেরও একটা দুর্বলতা আছে। সেই দুর্বলতায় কমিউনিস্টরা

কব্জা করতে পারে বলেই "যেখানে কমিউনিষ্ট যায়, সেখানেই

হটে যায়" এই রব চীনের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কমিউনিস্টরা কোন তন্ত্রমন্ত্র অথবা মন্ত্র যার সাহায্যে জাপানীদের

হটাতে সক্ষম হয়, তবে তাদের একটি মন্ত্র আছে, সে মন্ত্রটি যে-ই শুনে সে-ই কমিউনিস্টদের জন্য প্রাণ দেবার জন্য ছুটে আসে। সে মন্ত্রটি অতি ছোট এবং অতি সাধারণ। সে কথাটি হল 'তোমাদের গ্রাম তোমরা রক্ষা কর।' কিন্তু কথাটি তলিয়ে দেখা দরকার। যদি কেউ আমাদের এসে বলে 'তোমাদের গ্রাম তোমরা রক্ষা কর', তখন সর্বপ্রথমেই আমরা দেখব গ্রাম আমাদের নয়, অতএব 'তোমাদের গ্রাম তোমরা রক্ষা কর' এই বুলির কোন মানেই হয় না। কিন্তু কমিউনিস্টরা যখন বলে তোমাদের গ্রাম তোমাদেরই এবং তা রক্ষা করতে হবে, তখন তারা গ্রামখানাকে পুঁজিবাদীদের হাত থেকে আগে ছিনিয়ে এনে গ্রামের লোকের হাতেই দিয়ে দেয়। সেজন্যই কমিউনিস্টদের কথা সকলেই বিশ্বাস করে, পুঁজিবাদীদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করতে পারেও না। সেজন্যই চীনদেশের যেখানেই জাপানী সেনানীর সমাবেশ হয়েছে সেখানেই কমিউনিস্টরা এসে গ্রামের লোককে পুঁজিবাদীর শৃঙ্খল কেটে দিয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তারপর যখন গ্রামের লোক বুঝেছে যে গ্রামটা তাদের নিজেদেরই, তখনই রাতারাতি তারা তাদের পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা ভাবধারাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জাপানীদের সংগে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। কুমিং শহর তার জলন্ত নিদর্শন। হেনচোফোঁ তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। সাংহাই হতে ক'মাইল দূরে হেনচোফোঁ, কিন্তু এখনও তা জাপানীরা দখল করতে সক্ষম হয়নি। দু'মাস পূর্বে (১লা ডিসেম্বর ১৯৪২) হেনচোফোঁ জাপানীরা তিনবার আক্রমণ করেও দখল করতে সক্ষম হয়নি। এই মন্ত্রের বলেই কমিউনিস্টরা অসাধ্য সাধন করেছে। ফলে দেখা গিয়েছে চিয়াং কাই-শেক-বিরোধী লোক রাতারাতি চিয়াং-ভক্ত হয়ে গিয়েছে, পল্টনে ভর্তি হয়ে জাপানী সেপাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। একটু

আক্কেল খাটিয়ে যদি বুঝতে চেষ্টা করা যায় তবেই দেখতে পাওয়া যাবে পুঁজিবাদী চীন মত পরিবর্তনের পেছনে ছিল না, ছিল কমিউনিস্টরাই। কমিউনিস্টদের এই মন্ত্রের বল আছে বলেই দায়ে পড়ে চীনা পুঁজিবাদীরা কমিউনিস্টদের এডভান্স-গার্ডে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে এবং গ্রামের স্বাধীন সত্তা গাল ফুলিয়ে স্বীকার করছে। গালফোলা ভাব রেখেও যে এতটুকু স্বীকার করে নেওয়া তা চীনের চিয়াং কাই-শেক দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে, আর কারো দ্বারা কখনও হত কিনা জানি না। আমি এখানে সর্বান্তঃকরণে জেনারেল চিয়াংকে ধন্যবাদ দিয়ে বলছি তিনি প্রকৃতই একজন বীর।

এদিকে মাও-সুতনও কম গ্লানি স্বীকার করেননি। তিনি কখনও চুং পরিবারের সংগে ক্ষণিকের তরেও হাত মিলাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ধারণাও করতে পারেননি একদিন এতখানি গ্লানি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যে কারণে চুং পরিবার তাঁর সংগে হাত মিয়িয়েছে সেই কারণে তিনিও তাঁদের সংগে হাত মিলাতে বাধ্য হয়েছেন। চুং পরিবার এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছেন তাঁদের রাজত্বের অবসান হতে শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে যখন তাদের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতা জেগে ওঠে তখনই একটা গণ্ডগোল বেধে ওঠে, কিন্তু জাপান সেই বিবাদকে অধিকক্ষণ বেঁচে থাকতে দেয় না। ন্যাশানালিস্ট-কমিউনিস্ট বিবাদের সুযোগে জাপান পূর্ণ বিক্রমে চীনকে আক্রমণ করে আর জেলার পর জেলা দখল করে নেয়, জাপানের অত্যাচার সর্বদলের সুখমিলনের কারণ হয়ে যায়। বর্তমান যুদ্ধের ভেতর দিয়েই হয়ত দেখা যাবে চীনের পুঁজিবাদীরা তাঁদের শেষ অধিকার পর্যন্ত চীনের জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে উত্তর মহাসাগর হতে দক্ষিণ মহাসাগর পর্যন্ত সবই লাল হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এখন আর চীনের জনসাধারণের মধ্যে ধনী দরিদ্র বলে কোন কথাই নেই। জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে, এবার যদি তারা জাপানীদের রুখতে পারে তবে তাদের দেশে আর যুদ্ধ-ব্যবসায় চলবে না। ধনীরা পূর্বে যেমন করে শোষণ করত এখন আর সেরূপ করতে সক্ষম হবে না। তাই জনসাধারণ অতি অল্পই তোয়াক্কা রাখে কে ন্যাশানালিস্ট এবং কে ন্যাশানালিস্ট নয়। সর্বত্র কমিউনিস্টরা যেমন তাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি জাপানদ্রোহী সেনানীও তৈরী করছে। আমি একদিন একজন কমিউনিস্ট নেতার বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি যেভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে বললেন এতে তাঁর কথাগুলি যে-কোন সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে গিয়ে পড়ে। ন্যাশানালিস্ট চীনারা সেই বক্তৃতার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে সাহস করল না, কারণ আজ যারা জাপানকে রুখছে এবং রুখতে যাচ্ছে তারা তাদের ন্যায্য দাবী পেয়ে গেছে। বিবাদের অবসান লড়াইয়ের সংগে সংগেই হয়ে যাচ্ছে।

জাপান কখনও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধাচরণ করত না যদি তিনি মার্শাল চিয়াং হুয়া-লিয়াংএর আটটি প্রস্তাব অনুসারে কাজ করতে রাজি না হতেন। কমিউনিস্ট দলন করা ছিল মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের একটি কাজ। সেই কাজটি হতে তিনি বিরত হলেন কারণ তিনিও বুঝলেন পুঁজিবাদিত্ব কায়েম হয়ে থাকতে পারে না। তারপর তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে প্রকাশ্যে। ছুং পরিবারের স্যান-ফোঁ কোনদিনই জেনারেল চিয়াং কাই-শেকের সহায়তা করেন নি, ম্যাদাম স্থন্-ইয়াৎ-সেনও সকল সময়েই কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিলেন। এইরূপ নানা চিন্তার পর ছুং পরিবারের পরিচালক জেনারেল চিয়াং কাই-শেক, চিয়াং হুয়া-লিয়াংএর প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিনই আমি আমার

একজন সাথীকে বলেছিলাম, এবার যে-কোন সাম্রাজ্যবাদী চীনকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। মাস না যেতেই জাপান এসে চীনকে আক্রমণ করল। পৃথিবীর সাধারণ লোক বুঝল জাপান চীনকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু কূটনীতিজ্ঞরা জানল চীন আক্রমণ করার জন্য জাপানকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েটইজম আর না বৃদ্ধি পায়। জাপান দ্বিতীয়বার সাংহাই আক্রমণ করে সাংহাই দখল করে নিল। চীনের যে সকল ধনী তখনও ভাবছিল তাদের টাকাকড়ি থাকবে, তারা দেখল তাদের আর কিছুই থাকবে না। তখন তাদের ঘুম ভাংগল, আর চিন্তা না করে সকলে মিলে জাপানকে রুখে দাঁড়াল। কমিউনিস্টরা অবনত চীনা সমাজের পরিচালক হল। তারই ফলে আজও চীন দাঁড়িয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও গর্বের সহিতই দাঁড়িয়ে থাকবে।

জাপ শাসনের নমুনা

সাংহাই-এ তৃতীয়বার

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস, শীতটা একটু বেশি পড়েছে বলেই মনে হল। ইয়াকোহামা হতে গাড়ী হুহু করে কোবের দিকে চলছে। গাড়িটি বেশ আরামপ্রদ। আমি একটি সিটে বসে বাইরের বরফপাত দেখছিলাম। চারদিক বরফে সাদা। আমি বার বার সিগারেট টানছিলাম। আমার কাছে দেশলাই ছিল প্রচুর। অন্যান্য প্যাসেনজারের কাছে দেশলাই ছিল না। আমি কখন দেশলাই ধরাব, কামরার সবাই সেজন্য উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকত। আমি

লজ্জিত হয়ে শেষটায় একটি দেশলাইএর বাক্‌স টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। সবাই তার সদ্ব্যবহার করতে লাগল। বুঝলাম জাপানে খরচ কমাবার পালা শুরু হয়েছে। খরচ কমানটা শুধু দেশলাইএর দিক দিয়ে নয়, খাবারের দিক দিয়েও। এরই মধ্যে লোক সংবাদপত্রে লিখতে আরম্ভ করেছে জাপানে যত বিড়াল এবং কুকুর আছে সব মেরে ফেলা হোক। এসব কুকুর বিড়াল যা দৈনিক খাদ্য খায় তা দ্বারা লোকের পেট ভরান যেতে পারে। সংবাদপত্র চার পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। রেঁস্তোরায় এক কাপের বেশি চা পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না। রাত্রে ঘর গরম করার জন্য কয়লার বড়ই অভাব। আমি বসে বসে এসবই চিন্তা করছিলাম। গাড়িতে কিন্তু যখনই চায়ের আদেশ দিচ্ছিলাম তখনই চা পাচ্ছিলাম। চায়ের গরমে, সিটের আরামে মাঝে মাঝে আপনি চোখ বুঁজে আসছিল।

বিকালবেলা কোবেতে পৌঁছে ইণ্ডিয়ান হোটেলে গেলাম। সেখানে থাকবার এবং খাবার বেশ বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু বসবার ঘরে পৌঁছে আমার শরীরটা যেন বরফ হতে চলল। নিঃস্বর নামক একটি যুবক আমার দুরবস্থা দেখে কয়েক খণ্ড কয়লা আগুনে নিক্ষেপ করল, আগুন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল। আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। ইচ্ছা ছিল রুশদেশ বেড়িয়ে যাই কিন্তু সাইবেরিয়ার অগ্নিবায়ু আমাকে কাবু করেছিল, পাগুলি জ্বলছিল, শরীরে ফোস্‌কা পড়বে বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু এটা জাপান, উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের নীচে নেমে আসেনি। সইতে অনেকটা সক্ষম হয়েছিলাম।

কোবেতে গেইসা বালিকা মদের দোকানের কোমল চেয়ারে আর মাতালের কাছে বসে না। যে সকল পথে গভীর রাত্রেও দিনের আলোর মত আলো থাকত, বিজলীর বাতির অভাবে সে সকল

পথে আর বাতি নেই। এটা ব্ল্যাক-আউট নয়, কয়লার অভাব। জাতীয় যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য গোলা বারুদ তৈরী করার কারখানাতে যায় অর্ধেক কয়লা আর বিদেশে যে সকল তৈরীমাল পাঠাতে হবে সেগুলি যে সকল ফ্যাক্টরীতে তৈরী হয় তাতে যায় বাকি অর্ধেক কয়লা। আমোদপ্রমোদ করার জন্য পথে আলো রাখাটা জাপান সরকার মোটেই পছন্দ করেন নি। আমি সেজন্য তাদের কোন দোষ দিই না, বরং প্রশংসা করি। অনর্থক আমোদপ্রমোদ করে কি লাভ। কিন্তু ঐ যে রাত আসছে, কি ভয়ানক সে রাতগুলি। সন্ধ্যার পর হতেই পায়ে সূচ বিঁধে যাওয়ার মত ব্যথা হয়, অথচ ঘরগুলিতে একটুও আগুন নেই যাতে করে পা গরম করা যায়। করিম বলে এক আমেরিকা-ফেরতা যুবক আমার কষ্ট দেখে খুকস্তানের কাছে কয়লা চাইতে গেল। খুকস্তান তাকে এক ধমক দিয়ে বলল—"কোল কনত্রল"। মাথা নীচু করে এসে করিম বসে রইল। ঘরে বসে থাকাটা অসম্ভব দেখে আমরা গেলাম সিনেমায়। সিনেমা হলটা বেশ গরম বলেই মনে হল। কিন্তু সিনেমায় যে সকল বিষয়বস্তু ছিল তাতে আমাদের দেশের বৃত্র-সংহার পালাই যেন হচ্ছিল, আমি সেই দৃশ্য দেখতে মোটেই পছন্দ করলাম না। জাপান সিনেমা-জগতে অনেক পিছু থাকার নানা কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হল যারা সিনেমা-জগতের মালিক তাদের ফরমাইস মাফিক প্লট তৈরী করতে হয়। যেখানে পুঁজিবাদীরা চাবিকাঠি হাতে নিয়ে বসে আছে সেখানে কোন আর্টেরই বিকাশ হতে পারে না। আমরা সিনেমা হতে ফিরে আসলাম। রাতটা একরূপ বসে বসেই কাটাতে হয়েছিল।

পরদিন প্রাতে ইংরেজী দৈনিক 'ওসাকা মায়নিচি' পাঠ করলাম। জাপান তখনও নিরপেক্ষ থাকায় নানারূপ সংবাদ ছিল, কিন্তু চীন

সম্বন্ধে যে সকল সংবাদের সমাবেশ হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল চুংকিং ছাড়া জাপান সমুদায় চীনটাই দখল করে ফেলেছে। বৃটিশ এবং আমেরিকার 'ভাল ছাত্র' প্রপাগাণ্ডার দিক দিয়ে শিক্ষক মহাশয়দের এক ডিগ্রি ডিংগিয়ে গেছে, 'ওসাকা মায়নিচি' পাঠ করলেই তা বেশ বুঝা যায়। 'ওসাকা মায়নিচি'র প্রপাগাণ্ডার পরিমাণ কত, যাঁরা সংবাদপত্র পাঠে রত ছিলেন এ বিষয়ে তাঁদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি। সভ্যজগতে চীৎকার করে সংবাদপত্র পাঠ করা এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য করা অভদ্রতা।

কোবেতে ছিলাম সাত দিন। প্রত্যেক দিনই সংবাদপত্র পাঠ করতাম। একদিন সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম কোনও এক যুবক একটি যুবতীর গণ্ডদেশ ক্ষুর দিয়ে চিরে দিয়েছে। কারণ অব্যক্ত। ভারতবর্ষে এরূপ অন্যায় কাজ কত হয় তার কথা কেউ কানেও তোলে না। লোহা গরম করে যুবতী স্ত্রীকে সেক দেওয়াটা বাংলা দেশে প্রায়ই শোনা যায়। আমরা হলাম পরাধীন, আমাদের হিতাহিত জ্ঞান নেই, কিন্তু জাপানের মত উন্নতিশীল দেশেও ক্ষুর দিয়ে মহিলার গাল কেটে দেওয়াটা বড়ই অন্যায় বলে মনে হয়েছিল। তারপর কোথাও কোন ধনী বাড়ির তিনতলা হতে দশ ইয়েনের নোট ছেড়ে দিচ্ছেন গরীবের সাহায্যার্থে এসব সংবাদও সংবাদপত্রে বের হত। চুরি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা বলা জাপানে ছিল না একথা আমি ভারতে এসে কমপক্ষে লক্ষ লোককে বলেছিলাম। কিন্তু এবার দেখলাম জাপানীরা মিথ্যা বলতে শিখেছে, চুরি করতে শিখেছে, ঠকান তাদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোনার লংকায় পাপ ঢুকেছে। জাপানের দুর্দশা দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হয়েছিল। ধনীরা ঘরে বাইরে সমান। স্বকার্য সাধনের জন্য অপরকে যেমন অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে, তেমনি দরকার হলে

নিজের ঘরেও অমানুষিক অত্যাচার করতে কোনরূপ সংকোচ বোধ করে না। জাপান সাম্রাজ্যবাদীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট্ হয়েছে। ঘরে বাইরে লুট-তরাজ শুরু করেছে। আজ বাংলা-দেশে যেমন করে খাদ্যের অভাব শুরু হয়েছে, নানারূপ জিনিসের অভাব অনুভব হচ্ছে, ১৯৪০ সালের শেষভাগে জাপানেও সেই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু জাপান তখনও আমেরিকা হতে নানারূপ জিনিস পেত। চীনের নাম করে আমেরিকার সর্বসাধারণ যে সকল সাহায্য পাঠাত, ভুল-চুকে সেই সাহায্য জাপানে পৌছা সত্ত্বেও জাপানে দুর্ভিক্ষ এসে দেখা দিয়েছিল। সেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলতে গেলে এই দুর্মূল্য কাগজের বাজারে বইএর কলেবর বড় হয়ে যাবে, সেজন্য দুর্ভিক্ষের কথা বলা হল না। অনেকে হয়ত বলবেন, জাপান এখন শ্যাম, ইন্দোচীনের তংকিং প্রদেশ এবং বর্মাদেশের প্রচুর চাল পেয়েছে অতএব জাপানে আর খাদ্যাভাব হবে না। আমি একথা মানতে রাজি নই। তখনও শ্যাম, তংকিং এবং ব্রহ্মদেশ হতে চাল নিতে জাপানকে কেউ মানা করত না। তখন জাপানের চাল নিয়ে যাবার আরও সুবিধাই ছিল। সমুদ্র পথে জাপানের বাণিজ্য তরণী অর্থাৎ "মারু" শ্রেণীর জাহাজকে কেউ টরপেডো মারত না, উড়ো জাহাজ হতে বোমা ফেলে ধ্বংস করত না। এখন হয়ত কোন জাহাজই নিরাপদে জাপানে গিয়ে পৌছতে পারে না। জাপানের দারুণ অবস্থা জাপানীরাই ভাল করে জানে, এবিষয়ে আর বেশী বলে লাভ নেই। কোন একটা জাতের বাহ্যিক অবস্থা দেখে ভেতরের কথা বলতে যাওয়া আর নিজকে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ করা একই কথা।

এইত গেল প্রথম দৃশ্যের কথা। এবার দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু করলে বোধ হয় অনেকেরই আরাম লাগবে। প্রথম দৃশ্যে জাপানের বরুদ্ধে

অনেক কথাই বলা হয়েছে। এখন দেখব জাপানীদের পক্ষে কিছু বলা যেতে পারে কি না।

কোবের এন-ওয়াই-কে. লাইন অফিস হতে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে 'ওসাকা মারু'র একটি কেবিনে বসে ভাবছিলাম কি দুর্ভাগা দেশেই না জন্মেছি। কেনেডিয়ান পেসিফিক লাইনের জাহাজে টিকিট কেনার ইচ্ছা ছিল এবং সেজন্য টিকিট কিনতে গিয়েছিলামও। জাপানী কেরাণী আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল—আমার টিকিট বিক্রী করতে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আপনি হলেন ইণ্ডিয়ান, আপনার সংগে কেনেডিয়ানরা কি এক কেবিনে থাকতে রাজি হবে? যাক আমি একবার ম্যানেজারকে ডেকে দিই। এই বলেই কেরাণী ইউরোপীয় লালমুখো ম্যানেজারকে ডেকে আনল। লালমুখো লোকটি আমার কালোমুখ দেখেই বলল—বড়ই দুঃখের সহিত বলছি আমাদের জাহাজের একখানা বার্থও খালি নেই। কথাটা বলেই লালমুখো লোকটা চলে গেল। আমি জাহাজে বসে ভাবছিলাম, এই দুর্দিনেও ওদের উগ্র-প্রকৃতির উপশম হল না। যথা পূর্বং তথা পরংই রয়ে গেল। কেপস্টেন সিগারেটের কৌটটা কাছেই ছিল, তা হতে একটা সিগারেট বের করে ধরালাম এবং নীরবে উর্ধ আকাশে শীতের দিনের মেঘের খেলা দেখতে লাগলাম। মনে হল আকাশ বাতাস কিংবা মেঘের দিকে কটা চোখ যেমন চেয়ে দেখবার অধিকার রাখে কালো চোখও তেমনি চেয়ে দেখতে পারে। ধন্যবাদ বাতাস, ধন্যবাদ মেঘ, তোমাদের কাছে সবাই সমান। তোমরা সাদা কালোর কোন ভেদাভেদ রাখ না।

সমুদ্রে দু'দিন কাটবার পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা যখন বসেছিলাম তখন সাদা রুশটি লাল রুশদের নামে গালাগালি দিয়ে একখানা বইএর পাতা উলটিয়ে আমার দিকে চেয়েই আবার বইএর উলটানো

পাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমেরিকান দু'জন আমার নির্দেশ মত হাইফং হতে কুমিং যাবার মানচিত্র দেখছিল আর আমি তাদেরই দেওয়া Grapes Peakers Boys বলে একখানা বই মনদিয়ে পাঠ করছিলাম। এমনি সময় বয় এসে বলল সকালের খাবার দেওয়া হয়েছে। আমরা আপন আপন বই বন্ধ করে খানার টেবিলে গিয়ে বসলাম। ক্ষুধা সকলেরই বেশ ছিল তাই চপাচপ কাটা চামচে নড়তে লাগল, বয় দৌড়তে লাগল, মুখ মোছা হতে লাগল। তারপর একজন আমেরিকান "ইয়াপ" কথাটা বেশ শান্তির সহিত উচ্চারণ করে আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—তবে আমরা আর দু'দিন পরে সাংহাই যাব। প্রথম আমেরিকানের কথায় সম্মতি জানিয়ে দ্বিতীয় আমেরিকান এবং আমি উঠে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সাদা রুশটার শ্রাদ্ধ করতে লাগলাম। আমেরিকানটি বলল—লোকটা কী হারামজাদা, জাপানীদের বশুতা স্বীকার করতে রাজি তবুও লাল রুশদের ধ্বংস দেখতে চায়, লোকটা নিশ্চয় শূকরের বাচ্চাই হবে। আমরা দুজনে একই সংগে বললাম নিশ্চয়ই একেবারে পরাজয়ের মানসিকতা লোকটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমি বললাম—তবে কিনা জার যেমন সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন মিকাডোও তেমনি সাম্রাজ্যবাদী। পরিবর্তন লোকটা চায় না বলেই জাপানে গিয়ে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আপনাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরাও অনেকটা তাই। চীনের নাম করে চাঁদা উঠিয়ে জিনিসপত্র কিনে জাপানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মুখে বলছে ভুলে চীনের মাল জাপানে চলে গেছে। অবশ্য এটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।

যারা মজুর, যাদের মজুরীতেই জীবন ধারণ করতে হয় তাদের শরীরে সর্বত্র ক্ষত। সেই ক্ষতে নানারূপেই নুনের ছিটা পড়ছে। আমার আমেরিকান সাথীরাও নিম্নাভীত মজুরই ছিলেন তাই নুনের ছিটায়

তাঁদের ক্ষত বৃদ্ধি হল না। তাঁরা আমার কথায় সায় দিলেন। তারপর বলেছিলেন এ বিষয় নিয়ে সানফ্রানসিস্‌কোতে যেরূপভাবে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাঁরা আশা করেন ভবিষ্যতে এরূপ ভুল আর হবে না। চীনের মাল চীনেই পৌঁছবে।

দুদিন সময় যেন কাটতে চাইছিল না তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যান্য যাত্রীদের সংগেও মেলামেশা করতে লাগলাম। সৌভাগ্যক্রমে একজন জাপানীর সংগে কথা হয়। তিনি চলেছেন চীনদেশের নতুন শাসনের পরিচালনাকে ফলবতী করতে। দেশে থাকতে একবার সাইমন কমিশন এসেছিল, ভদ্রলোককে দেখে সাইমন কমিশনের কথাটা চটপট মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম জাপান হতে চীনে হয়ত সাইমন কমিশন যাচ্ছে, কিন্তু কথা হল চীনে মাইনরিটি মেজরিটি বলে কিছু নেই। চীনে গিয়ে এই ভদ্রলোক করবেন কি? কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়-বান্দা। তিনি আমাকে তাঁর পরিকল্পনা বুঝাতে লাগলেন। জাপানী ভদ্রলোকের বলার বেশ কায়দা ছিল, আমি তা মন দিয়েই শুনছিলাম। তিনি যত প্লেনই বলছিলেন সকল প্লেনের পেছনেই ছিল জাপানের সংগে অন্যান্য দেশবাসীর সহযোগিতা সমূহ দরকার। ভদ্রলোক জানতেন না এযুগে কেউ কারো সংগে সহযোগিতা করতে রাজি নয়। এযুগে সবাই একের সংগে অন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে চায়। তার সহযোগিতার পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদ বা কমনওয়েলথের ইংগিত। যারা কমনওয়েলথ কাকে বলে জানে তারাই জানে অর্থনৈতিক পরাধীনতার মানে কি। আমি ভদ্রলোকের কথার সারমর্ম বুঝতে পেরে জবাবও দিয়েছিলাম এবং বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম এযুগে অর্থনৈতিক পরাধীনতা কেউ চায় না। সবাই চায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে। এতে তাঁর ভয়ানক রাগ হয় এবং চটে গিয়ে আমাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে

বসেন। আমার নামে এতবড় বদনাম সহ্য করতে না পেয়ে আমিও তাঁকে তৎক্ষণাৎ বলেছিলাম আপনি সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া আর কিছুই নন। সাম্রাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে আমার যা অভিমত তাও বলেছিলাম। উপসংহারে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি কোন 'ইস্ট'ই নই, তবে আমি একজন পর্যটক একথা অবাধে স্বীকার করবই। পথে বেড়াবার সময় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাই শুধু বলছি। এর পরে ভদ্রলোকের সংগে যে অভদ্রতাসূচক কথা হয়েছিল তা না বলাই ভাল।

বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। জাহাজেই শরীরটা ঠক্ ঠক্ করছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হতো ডেকে গিয়ে একটু হাঁটি কিন্তু সাহস পেতাম না। দুজন আমেরিকান, একজন পলাতক রুশ আর আমি, এ চারজনে মিলে বসে যত রাজ্যের গল্প বলে সময় কাটাতাম। ইউরোপে তখন বেশ যুদ্ধ চলছে। রুশ তখনও যুদ্ধে নামেনি। জাপান পুরাদমে যুদ্ধের সরন্জাম তৈরী করতে ব্যস্ত। আমেরিকা তখনও চীনকে মুখে মুখেই সাহায্য করছিল। বর্মা রোড কখনও খুলত আর কখনও বন্ধ হতো। রেংগুনে তখন ব্যবসায়ীর দল কাক চিলের মত আমেরিকান ডলারের অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল; ওয়াং-চি-ওয়াই চুংকিং হতে পালিয়ে পায়ে হেঁটে হানয় এসে সমুদ্রপথে সাংহাই এসে পৌঁছেচেন। তিনি এখন দ্বিতীয় 'হেনরী পুই' হয়েছেন। জাপানীদের মারফতে শুনলাম, জার্মানরা সাংহাইএ ইংরেজীতে সংবাদপত্র বের করেছে। টাটকা মস্কো নিউজ ফ্রেঞ্চ কনসেসনে পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার সিগারেট, দক্ষিণ আমেরিকার সংবাদপত্র, কোলকাতা এবং বম্বের দৈনিক সংবাদপত্র সবই পাওয়া যায়। মনে মনে ভাবলাম এই দুর্দিনে সাংহাই-এর মত স্থানই ভাল। দুনিয়ার সকল সংবাদ পাওয়া যাবে, আর যদি ব্যবসাতে লেগে যাই তাতেও ক্ষতি হবে না, পৃথিবী ভ্রমণ করা আমার হয়ে গেছে।

সাংহাই-এ বসে বই ছাপাতেও কষ্ট হবে না। এই মতলবটি মনে মনে অনবরত আঁটছিলাম এবং সাংহাই কেমন হবে, এর মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তারই কথা সকলকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

দিন কেটে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে একদিন গাঢ় কুয়াশার মাঝে 'আসামা মারু' পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে ইয়াংসী নদীর মোহনাতে প্রবেশ করতে লাগল। এরূপ কুয়াশার অন্ধকারে জাহাজে জাহাজে ঠোক্কর লাগবার সম্ভাবনা থাকে। চীনাদের জাহাজ নেই, অতএব চীনা এবং জাপানী জাহাজে ঠোক্কর লাগার কোন ভয় ছিল না। বেলা আটটার সময় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। নদীতীরের দুদিকের সকল জিনিসই দেখা যাচ্ছিল। নানা দেশের নানা জাতীয় পতাকা তুলে অনেকগুলি জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করে অন্য দেশের বন্দরের দিকে চলে যাচ্ছিল। জাহাজের জাপানী যাত্রীরা উৎসুক নয়নে দুকূলের দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়েছিল। যখনই কোন ছোট জাপানী জাহাজ আমাদের পাশ কেটে যাচ্ছিল তখনই জাপানীরা চিৎকার করে তাদের ভালবাসা জানাচ্ছিল। ক্রমে জাহাজ ইংয়াসী নদী ছেড়ে দিয়ে সাংহাই নদীতে প্রবেশ করল।

অদূরে কয়েকখানা জার্মান জাহাজ স্বস্তিক পতাকা উড়িয়ে নোংগর করে দাঁড়িয়ে ছিল। চীনা মাঝি এবং মজুরের দল গোবেচারীর মত এক জাহাজ হতে অন্য জাহাজে মাল বোঝাই করছিল। তাদের দেশে অনবরত বিপদ ঘটছে তাদের মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল। জাহাজ ক্রমে উজাং কেল্লার কাছে এল। কেল্লাতে একখানা ঘরও দাঁড়িয়ে ছিল না। কয়েকটি দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর যতই আমরা জাপানী ডকের কাছে আসতে লাগলাম, জাপানীরা ততই উদগ্রীব হয়ে উঠল এবং তাদের ভাষায় নানারূপ জাতীয় জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

জাহাজ ডকে লাগা মাত্রই চীনা কুলিরা এবার নীরবে মাথা নত করে ধীরে ধীরে জাহাজে এসে উঠল। তাদের শরীরের দিকে তাকালেই বুঝা যায় অভাবের জন্যই এরা কাজে এসেছে। মুখে তাদের গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে, তারা আর ছুটাছুটি করছে না। দেশাত্মবোধ তাদের পুরাতন অবিমৃষ্যকারিতাকে লোপ করে দিয়েছে। সাম্রাজ্যমদে মাতাল জাপানীদের মনে এবার পাপ ঢুকেছে তাই তাদের মুখে নানারূপ অপবিত্র ভাবেরও বিকাশ হচ্ছে।

আমাকে এবার আর পাসপোর্ট দেখাতে হল না। যেন জাপানেরই কোন বন্দর হতে জাহাজ রওনা হয়ে জাপানেরই কোন বন্দরে গিয়ে লেগেছে, পাসপোর্টের কোন দরকার নেই। জাহাজ হতে নেমে একখানা রিক্‌সা করে নিকটস্থ একটা হোটেলে গেলাম, সেখানে স্থানাভাব দেখলাম। তারপর অন্যান্য হোটেলে যেতে লাগলাম। কোথাও স্থান নেই, সর্বত্রই জাপানীরা স্থান দখল করে নিয়েছে। স্থানাভাবে মহা বিপদে পড়লাম। কয়েকটা হোটেলে দৈনিক থাকার চার্জ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথাও দৈনিক দশ ডলারের কম থাকা যায় না। পূর্বে এক চীনা ডলারে যে জিনিস পাওয়া যেত এখন তা কিনতে চার ডলার লাগে। জাপানীরা মিলিটারী নোট চালিয়ে কোনই অভাব অনুভব করছে না, চীনারা কিন্তু তাদের আয়ও বাড়াতে পারছে না, জিনিসও কিনতে পারছে না। এর ফল দাঁড়িয়েছে ভীষণ। কোন কোন জিনিসের দাম দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল, যেমন চাল এবং কয়লা।

চুংকিং সরকার মিলিটারী নোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য চীনা কাগজের মুদ্রার দাম কমিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং জাপানীদেরও বাধ্য হয়ে তাদের মিলিটারী নোটের দাম কমাতে হয়েছিল চীনা মুদ্রার সংগে সমতা রাখবার জন্য। চীনা নোটের পেছনে Promise to pay

লেখা ছিল, জাপানী মুদ্রার পেছনে কিছুই লেখা ছিল না। জাপানী মিলিটারী নোটের জন্য Nobody promises to pay anything. ব্যবসায়ের দিক দিয়ে মহা গণ্ডগোল বাধছিল।

রাতটা শিখদের সংগে কাটিয়ে পরের দিন আমি একটা সজ্জিত ঘর ভাড়া নিই, তাতে আমার দৈনিক আমাদের দেশের এক টাকার মত খরচ হতো। ঘরখানা ছিল বেশ ভালই, কিন্তু চোরের মহা উপদ্রব। ঘর থেকে বার হবার সময় সর্বস্ব সংগে করে নিয়ে যেতে বাধ্য হতাম।

তৃতীয় দিন সকালে আমি ইনটারন্যাশনাল সেট্‌লমেণ্টের দিকে রওনা হই। পথে পড়ল হাংকিউ ক্রিক। হাংকিউ ক্রিকের ওপর সেতু রয়েছে। সেতুর অর্ধপথে একদিকে জাপানী ইম্পিরিয়েল সেপাই, অন্যদিকে বৃটিশ সেপাই দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। আমি জাপানী সেপাই-এর কাছে যাওয়া মাত্র একজন সেপাই ইংরেজীতে আমাকে বলল টুপি খুলে সেলাম করতে। আমি তাতে আপত্তি জানালাম। লোকটি আমার পাসপোর্ট দেখল এবং মুখের এমন একটা ভংগি করল যাতে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। আমি অন্যদিকে যাবার পর বৃটিশ সেপাইরা আমাকে যেন দেখতেই পায়নি এমনি ভান করল। তারা কারো কাছে সেলাম কখনও দাবী করেনি। জাপানের ইম্পিরিয়েল গার্ড যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে প্রত্যেককে সেলাম করতে হবে এই ছিল আদেশ। বিদেশীরা এতে আপত্তি করার ফলে বিদেশীরাই শুধু সেলাম ঠুকা থেকে রেহাই পায়। আমিও বিদেশী বলেই রেহাই পেয়েছিলাম। জাপানীদের নিকট জাপানের সম্রাট হলেন দেবতা, তাঁকে প্রণাম করা অবশ্য কর্তব্য। তাই তাঁর প্রজারা তাঁকে অন্ধভক্তিতেই পূজা করে।

পূর্বেই বলেছি আমি থাকতাম হাংকিউ ক্রিকের কাছেই। বার বার আমাকে বৃটিশ শহরে আসতে হতো। বার বার জাপানী

ইম্পিরিয়েলিস্ট সেপাইরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। সাংহাই-এ কয়েকজন জাপানীভক্ত ওরফে ইংরেজবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁরা জাপানী গার্ডদের বেশ মাথা নত করে মনেপ্রাণেই সেলাম করতেন। আমার দ্বারা তা সম্ভব নয় বলেই তাঁদের সংগে আমি বেড়াতে বার হতাম না। কয়েকজন আমাকে উপহাস করে বলতেন—জাপানী গার্ডকে এত তাচ্ছিল্য কেন? আমি তাঁদের বলতাম—এসব সেপাই সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটে লোক। ওদের সেলাম করা আর সাম্রাজ্যবাদীদের সেলাম করা একই কথা। আমি কায়মনোবাক্যে চাই সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক, সেজন্যই জাপানী গার্ডদের বিষদৃষ্টিতেই দেখি।

সাম্রাজ্যবাদীর স্বরূপ অনেকে বুঝে না। কিন্তু যদি তখনকার দিনে যে-কোন লোক সাংহাই দেখত তবে বুঝত সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে। ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর চেলাচামুণ্ডারা বড় বড় হোটেলে বসবাস করছে, আরামে দিন কাটাচ্ছে। বাইরে যখন বেরুচ্ছে তখন নোটের তাড়া পকেটে রেখে মদগর্বে পথ কাঁপিয়ে চলছে। যেন তারাও এদেশের লোক নয়, পারলে তারা অন্যান্য চীনাদের "ড্যাম নেটিভ" বলেই গাল দেয় আর কি! কিন্তু মুখের আকৃতি বদলাতে পারছে না বলেই সেরূপ কিছু বলতে পারছে না! জাপানীরা নিজেদের জন্য ক্যানটিন খুলেছে। সেই ক্যানটিন হতে চীনারা কোনরূপ জিনিস কিনতে পারে না, অথচ যে সকল মাল মজুত করে রাখা হয়েছে তা জাপান হতে আসেনি। অন্যান্য চীনারা কুকুর বিড়ালের মত পথে ঘাটে মরছে। যে লোকটি একদিন ধনী ছিল, সর্বসাধারণের কাছে যার বেশ সম্মান ছিল, দাতা বলে পরিচিত ছিল, সেই লোক আজ পথে পথে ঘুরছে এক মুঠা ভাতের জন্য। তার দোষ সে সাংহাই হতে পালাতে পারেনি। ওয়াং-চিং-ওয়াই এঁসব লোককে দলে টানতে

চান। কিন্তু যার একটু বিবেক আছে, একটু বিচার-বুদ্ধি আছে, সে এই অবস্থায় জাপানীদের সহযোগিতা করতে পারে না। না খেয়ে মরাটা এর চেয়ে ভাল বলেই তারা গণ্য করে। কোথায় শিশু পুত্র-কন্যা, কোথায় স্ত্রী, আর কোথায় বা আত্মীয় স্বজন! কে কোথায় গেছে সেজন্য কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না, সবাই চায় এক মুঠা ভাত আর একটু স্থান যেখানে বৃষ্টির জল আর বরফ এসে তাদের কংকাল-সার দেহকে একদম জমিয়ে না ফেলে। এই যে বাঁচবার অসহায় চেষ্টা এই ভাবটা আছে পরাজিত লোকের মাঝেই। কিন্তু সকলে কি পরাজয় স্বীকার করে? কখনও না। যাদের মগজে প্রগতিশীল ভাবধারা ঢুকেছে তারা বসে থাকে না, কাজ করে যায় আমরণ, কারণ সে জানে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ অমানুষ হয়েই থাকবে। সেই প্রেরণাতেই এই আধমরা শুষ্ক রুগ্ন দরিদ্র প্রগতিশীলরা অনবরত কাজ করে যাচ্ছে।

জাপানীদের পোষ্য ওয়াং-চিং-ওয়াই থাকেন একটা বড় বাড়িতে। সেই বাড়িটির চারদিকে জাপানী ইম্‌পিরিয়েলিস্ট গার্ড সকল সময়েই অতি সাবধানে পাহারা দিচ্ছে। চীনারা সেদিকে যাওয়া আসাও করতে পারে না। যারা সেদিকে যায় তাদের প্রত্যেকের পরিচয়পত্র থাকা চাই। পরিচয়পত্র নিয়ে যারা সেদিকে যায় তাদের শরীর তল্লাস করা হয়, নানারূপ প্রশ্ন করা হয়, তারপর সেদিকে যাবার অধিকার দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে এত সতর্কতা সেখানেও মাঝে মাঝে পিস্তল হতে গুলি বের হয়ে আসে, বোমা ফাটে, হাত-বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি অনুভব করেছি পৃথিবীতে চীনাদের ধ্বংসের কোন কারণ নেই। কিন্তু একটা কথা বার বারই মনে হতে লাগল। তা এই যে, জাপানীদের ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর সাহায্য

নেওয়ায় কি দরকার ছিল? বর্তমানে যে স্থানটা জাপানীর। ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর নাম করে শাসন করছে, সে স্থানটা তারা ওয়াং-চিং-ওয়াই ছাড়াও কি শাসন করতে পারত না? তবে কি সাম্রাজ্যবাদীরা সকল সময়েই মিরজাফর বেছে নিতে ভালবাসে? যদি তাই না হবে তবে এরূপ করার কারণ কি? কারণ যাই থাক সে সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে। আমার একদিন ধারণা ছিল জাপানীরা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মত ভেদনীতি চালিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চাইবে না। কিন্তু এবার নিয়ে তিনবার জাপানীদের ভেদনীতির পরিচয় পেয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। মনে হল সাম্রাজ্যবাদীর তুলনা শুধু সাম্রাজ্যবাদীর সংগেই হয়। সাম্রাজ্যবাদী যদি আপন ভাইও হয় তবে তাকেও কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

জাপানীরা চীনে প্রবেশ করল চীনাদের মুক্তি দেবার জন্য, কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম চীনাদের মুক্তি দেবার বদলে জাপানীরা চীনের ঘাড়ে চড়ে বসেছে। এটাকেই যদি বলা হয় এশিয়া এশিয়াবাসীরই জন্য, তবে এমন স্বাধীনতার স্বরূপ কি তা জাপানীরাই জানে। স্বাধীনতা কেউ কাউকে এনে দিতে পারে না। যারা অপরের স্বাধীনতা এনে দেবে বলে, মনে রাখতে হবে এই 'এনে দেবার' পেছনে এমন একটা মোটা দরের কমিশন আছে যে কমিশন শোধ করবার ক্ষমতা কারো হয়ে উঠে না। জাপানীরা ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর নামে চীনদেশের যে অংশটা শাসন করছে তাতে কিরূপ কমিশন পাচ্ছে তা দেখে এসেছি এবং তাই সংক্ষেপে বলেছি। পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরাও জাপানীর ন্যায় পাপী সেকথা সকলেই জানে।

লাল চীন জিন্দাবাদ!